তৃতীয় অধ্যায়

সত্তর দশক : নিম্নবর্গ ভাবনার নতুন আলোক

রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত ও রক্তাক্ত সংক্রমণজাত তির্যক প্রতিবাদী চেতনা-ই সমাজব্যবস্থায় বৈপ্লবিক উত্থান ঘটায়। এই উত্থান সবসময় সফল না হলেও সমাজের সর্বস্তরে একটা আলোড়ন তোলে। পশ্চিমবঙ্গের বুকে সত্তর দশক এরকম একটি আলোড়িত সময়। ভারতের ইতিহাসে সময়টা জটিল এবং বহুমাত্রিক। বিপ্লবী শ্রেণি চেতনার সংগ্রামী বিকাশ ঘটেছিল বামপন্থী রাজনীতির প্রসারের ফলে। একথা অনস্বীকার্য দেশকে দ্বি-খণ্ডিত করে যে স্বাধীনতা এসেছিল তা কখনো সাধারণের সুখের বস্তু হয়নি। বহুযুগ ধরে বিদেশি শক্তির শাসন মাথা পেতে নিয়ে দেশ যখন স্বাধীন হল তখনও প্রভুশক্তির বিনাশ হল না। ধনতন্ত্র-গণতন্ত্রের মাঝে পড়ে সৃষ্টি হল এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। ধনতন্ত্রের সংকট, বাজার দখলের লড়াই ও উপনিবেশের জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে সারা পৃথিবীতে মার্কসবাদ ও সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের প্রতি আগ্রহ। শ্রমজীবী উৎপাদনশীল সাধারণ মানুষ দেখেছে বিপ্লবের স্বপ্ন। ভারতবর্ষে বিপ্লবের স্বপ্ন চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল সত্তরের দশকে। তবে সত্তর দশকের আগে চল্লিশের দশককে বাংলার ইতিহাসে তথা পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দশক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এর বিরুদ্ধে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সাফল্য মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে আর সারা পৃথিবীতে নতুন নতুন আন্দোলনের জন্ম দেয়, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, আদিবাসী আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, ঔপনিবেশিক ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিশ্বপুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে মানবতার নতুন শক্তি, নতুন দর্শন।

সত্তর দশকের রাজনৈতিক ঘটনাবলী আমাদের আলোচ্য, তবে সমগ্র ইতিহাস নয়, তা ঐতিহাসিকের কাজ। এখানে যা করা যেতে পারে তা হল বিভিন্ন ঘটনা ও আন্দোলন থেকে কিছু তথ্য সাজিয়ে দেওয়া, যার মধ্য দিয়ে সমগ্র সত্তর দশকের আন্দোলনগুলির একটি রেখাচিত্র হয়তো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ষাট দশক শেষ হয়েছিল বিশাল রাজনৈতিক প্রত্যাশা ও ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী উত্তেজনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সত্তরের আন্দোলনগুলির পূর্বসূত্র অন্বেষণ করতে হলে শুধু ষাট দশক নয়, আরও পূর্বের ইতিহাস অর্থাৎ প্রয়োজন উৎসে প্রত্যাবর্তনের তাগিদ।

উত্তাল বিশশতক : ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার

১৯০৫ → বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন।

১৯১২ → মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় মার্কসের উল্লেখ।

১৯১৪ → প্রথম মহাযুদ্ধ, ভারত রক্ষা আইন।

১৯১৭-র মার্চ → রাশিয়ান বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়।

→ রুশ বিপ্লবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মেহনতি মানুষের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

→ লেনিনের অভ্যুত্থানের ডাক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে একটা নতুন জোয়ার নিয়ে আসে।

→ খিলাফত আন্দোলনের মতো ঘটনা ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বীজ রোপণ করে।

১৯১৯ → রাওলাট আইন।

→ মার্চ-এপ্রিল দেশজুড়ে হরতাল ও ধর্মঘট পালিত হয়।

→ ২মার্চ-৬মার্চ ২৯টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে মস্কোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে গড়ে ওঠা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় ৪১টি দেশের ২১৭ জন প্রতিনিধি সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

১৯২০ → সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, প্রতিবাদ।

→ ১৭ই অক্টোবর এম.এন.রায় উজবেকিস্থানের তাশখন্দ শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২১ → পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯২৪ → কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯২৭-২৮ → চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অধিকাংশের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মাও এর হুনানে প্রত্যাবর্তন ও এতদিনের প্রথাগত মার্কসবাদী রণকৌশল-এর পরিবর্তে কৃষকদের সশস্ত্র করে গ্রামে মুক্তাঞ্চল কায়েমের যুগান্তকারী রণকৌশলের প্রবর্তন।

১৯২৯ → মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। সব থেকে সাড়া জাগানো মামলা। পৃথিবীতে এত দীর্ঘদিনব্যাপী চলা কোনও রাজনৈতিক মকদ্দমা এর আগে হয়নি। এই মামলায় গ্রেফতার করা হয় দুজন ব্রিটিশ কমিউনিস্টকে। এই মামলা

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। এই সময়েই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৯৩০ → ভারতের পার্টিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত হলেও সেটা স্থগিত রাখা হয়।

১৯৩৩ → মীরাটের বন্দিরা মুক্তি পাবার পরই কলকাতাতে একটা গোপন সম্মেলন করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রস্তাব এবং গঠনতন্ত্র রচনা করা হয়। এই সম্মেলনের পরই গ্রুপগুলো একসঙ্গে মিলে একটা রাজনৈতিক পার্টিতে পরিণত হয়।

১৯৪৩ → বোম্বাই শহরে প্রথম পার্টি কংগ্রেস হয়।

১৯৪৫-৪৬ → সারা ভারতে অভূতপূর্ব কৃষক জাগরণ দেখা দেয়। বাংলাতেও ফসলের তিনভাগ ও প্রজাস্বত্বের দাবিতে তেভাগা আন্দোলন বিশাল আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষক ছিল প্রায় ৬০ লক্ষ। সমস্ত কৃষক আন্দোলনে এটা ছিল সুবর্ণযুগ। আন্দোলনের বিশালতায়, আবেগের তীব্রতায়, শ্রেণিগত ঘৃণার প্রকাশভঙ্গিতে এই সংগ্রাম ছিল শ্রেণিসংগ্রামের চূড়ান্ত স্তর। সর্বত্রই আওয়াজ ওঠে 'আধি নয় তেভাগা চাই, জান দিব তবু ধান দিব না'। তেভাগা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান ও আদিবাসীদের অভূতপূর্ব ঐক্য দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন স্থানে জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষকরা মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস পেয়েছিল। এর মধ্যে কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ → বৃটিশ ভারত বিভক্ত হওয়ার পর বাংলাদেশের দুই অংশেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদ করা হয়।

১৯৪৮ → ২৮ফেব্রুয়ারি-৬ মার্চ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সর্বভারতীয় কংগ্রেসে 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' যে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে পরবর্তীকালে নানা বিতর্ক হয়।

১৯৫০ → ভূমি সংস্কারের জন্য ভারতে কৃষকসভার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৫১ → তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় মাদুরাইতে।

১৯৫৪ → ভারত ও চীনের মধ্যে তিব্বত নিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চশীল নীতির ওপর দাঁড়িয়েছিল।

→ জমিদারি অধিগ্রহণ বিল আইনে পরিণত হয়।

১৯৫৫ → সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের নেতাদের মধ্যে ভ্রমণ বিনিময়ের ফলে ভারতের সঙ্গে চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক বান্দুং সম্মেলনে জোট—নিরপেক্ষ দেশগুলির অবস্থান সুনিশ্চিত হয়।

→ সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, বর্গাদার আইন ইত্যাদি উচ্ছেদ করে ভূমি-সংস্কারের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সরকার একটি ভূমি-সংস্কার বিল পেশ করে। প্রবর্তিত হয় ভূমি-সংস্কার আইন।

১৯৫৬ → চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় পালঘাটে।

→ ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির (C.P.S.U.) বিংশ পার্টি কংগ্রেস স্তালিনকে (১৯৫৩ সালে সোভিয়েত রাশিয়াতে কম. স্তালিনের এমৃত্যু) আক্রমণ করে এবং শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্বকে নাকচ করে সে দেশকে 'জনগণের রাষ্ট্র' বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ও চীনা পার্টি (C.P.C.)-র সম্পর্কে অবনতি হয়। ভারতের কমিউনিস্টপার্টির কর্মীরাও সোভিয়েতপন্থী, চীনাপন্থী ও মধ্যপন্থী এই তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়।

১৯৫৭ → মাওলানা ভাসানি আওয়ামি লীগ পরিত্যাগ করার পর তাঁর নেতৃত্বে ও কমিউনিস্টদের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি নামে কৃষকদের একটি সংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠনটিই হয়ে দাঁড়ায় কৃষকদের একমাত্র পূর্ববাংলা ভিত্তিক সংগঠন।

→ জানুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভায় খাজনার নির্যাতন বন্ধ, সার্টিফিকেট প্রথা রহিতকরণ এবং অন্যান্য সংস্কারের বিষয়ে তৎকালীন আওয়ামি লীগ-গণতন্ত্রী, দল কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৫৮ → সামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের ফলে যে সামান্য সংস্কার ঐ সম্মেলনে প্রস্তাব করা হয়েছিল সেটিও কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

১৯৫৯ → ভারত চীন সীমান্তে সংঘর্ষ।

১৯৬০ → মস্কোতে পৃথিবীর ৮১টি দেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এক যুক্ত বিবৃতির প্রচার করে যা ৮১টি পার্টি ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তীব্র মত পার্থক্য ঘটায়। এই মত-পার্থক্যের প্রভাব বিশ্বের সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ওপরে পড়ে।

১৯৬১ → ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, বেজওয়াদায়। এরপরই কমিউনিস্ট পার্টিতে অন্তঃবিরোধ তীব্র হয় এবং পার্টি ভাঙতে থাকে।

১৯৬২ → পুনরায় সীমান্ত সংঘর্ষ বৃহৎ আকার ধারণ করে।

→ কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার তুঙ্গে ওঠে।

→ চীন-ভারত যুদ্ধ ঘোষণা।

→ ১২ই অক্টোবর ভারতসরকার ভারতীয় ফৌজকে ‘সীমান্ত মুক্ত’ করার আদেশ দেয়।

→ ২০শে অক্টোবর জহরলাল নেহেরু নির্দেশ দিলেন সর্বাত্মক যুদ্ধের।

→ চীনপন্থী সন্দেহে ভারতসরকার তখন বেছে বেছে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের জেলে ভরতে লাগল। কমিউনিস্ট পার্টির তদানিন্তন অনেক প্রাদেশিক নেতৃত্বের সাথে গ্রেফতার করা হল দার্জিলিং জেলার কমিউনিস্ট নেতা চারু মজুমদার, কানু সান্যালকে। কলকাতায় গ্রেফতার হলেন সরোজ দত্ত, সুশীতল রায়চৌধুরী প্রমুখ।

→ সীমান্ত যুদ্ধের ফলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। কল-কারখানায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ হয়।

১৯৬৩ → চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের উত্তেজনা কমে। কমিউনিস্টরা আবার গণ আন্দোলন শুরু করেন।

→ ১৩ই সেপ্টেম্বর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশে সাক্ষর গ্রহণ করে মহা আবেদনপত্র পার্লামেন্টে পেশ করে। ১ কোটি ২ লক্ষ মানুষ মহা আবেদনপত্রে সই দেন। ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতির প্রতি সমর্থন ও ব্যাঙ্ক, তেল শিল্প, বিদেশ-বাণিজ্য জাতীয় করণের আবেদন জানানো হয়।

১৯৬৪ → প্রথম দিকে ইনস্টিটিউট অফ মার্কসিজম লেনিনিজম গড়ে উঠেছিল।

→ ডিসেম্বরে মুম্বাই-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই)-র ৭ম কংগ্রেস কর্মসূচিতে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

→ এপ্রিল মাসের মধ্যেই ভারত রক্ষা আইনে বন্দী কমিউনিস্টদের অধিকাংশই মুক্তি পেলেন।

→ গড়ে ওঠে ইনস্টিটিউট অফ মার্কসিজম-লেনিনিজম্'।

→ ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতার ত্যাগরাজ হলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নামে যে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল, যারা ৭ নভেম্বর মনুমেন্ট ময়দানে (শহীদ মিনার) প্রকাশ্য সভায় তাদের কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষণা করল কিছুদিন বাদে তারাই নিজেদেরকে সি.পি.আই (এম) বা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বলে পরিচয় দিল। প্রায় ঐ একই সময়ে ১৩ থেকে ২৩ ডিসেম্বর বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতীয় পরিষদের সমর্থকদের কংগ্রেস। ফলে তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নামে সমান্তরাল দুটি সংগঠন কাজ করতে থাকে। [১]

→ এই সালে কমিউনিস্টরা দুভাগে ভাগ হয়ে যান। যে যার আলাদা পার্টি কংগ্রেস শুরু করেন।

→ ৭-১১ জুলাই বামপন্থী নেতৃত্বের উদ্যোগে তেনালী সম্মেলন।

১৯৬৫ → ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়।

→ জানুয়ারি মাস থেকেই আবার সারা ভারতব্যাপী সরকারি সন্ত্রাস শুরু হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দকে বিনা বিচারে গ্রেফতার করা হয়।

→ শেষ পর্যন্ত তাশখন্দ চুক্তির মাধ্যমে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধ হয়।

→ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন আদর্শগত মত-পার্থক্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়। সি.পি.আই. বলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে, তারপর হবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। সি.পি.আই (এম) বলে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত। সি.পি.আই (এম)কে বলা হয় অতিবাম হঠকারী দল, বামসংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির দল।

→ দুই দলের সম্পর্কের অবনতি, একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে দুর্বল হয়।

→ সি.পি.এস.ইউ এর বিংশতি পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ স্তালিন বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করেন। সি.পি.আই. এর মধ্যেও স্তালিন প্রশ্ন নিয়ে মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু হয়।

→ কংগ্রেস বিরোধী গণরোষ তীব্র হয়ে ওঠে। পার্টির মধ্যে ধীরে ধীরে দুটি পরস্পর-বিরোধী প্রবণতা গড়ে ওঠে। একদিকে পার্টিনেতৃত্বের নির্বাচনমুখী সংসদ-সর্বস্ব রাজনীতি অন্যদিকে কমিউনিস্ট কর্মীবাহিনীর সংগ্রামমুখী বিপ্লবকামী রাজনীতি।

→ ট্রাম আন্দোলন।

→ চারু মজুমদার তাঁর আন্তঃপার্টি মতাদর্শগত দলিলগুলি লিখতে থাকেন।

১৯৬৬ → কংগ্রেসি শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে উত্তাল খাদ্য আন্দোলন, বন্দীমুক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

→ ফ্রান্স, আমেরিকা, ভিয়েতনাম, বর্মা সর্বত্র বিক্ষোভ বিদ্রোহের ডাক।

→ সেপ্টেম্বর মাসে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে উত্তরবঙ্গে চা শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট। ১২ জুলাই জনগণের এক বিশাল সমাবেশ থেকে জন্ম নেয়, ১২-ই জুলাই কমিটি। মে মাসে চারু মজুমদারকে মুক্তি দেয় সরকার।

→ এ বছরের শেষের দিকে নকশালবাড়িতে জোতদার-কৃষকদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

→ মার্চ-এপ্রিলে খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভ।

১৯৬৭ → সাধারণ নির্বাচনে ঐতিহাসিক পালাবদল ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। সি.পি.আই (এম) এর নেতৃত্বে সংযুক্ত বামফ্রন্ট (U.L.F.) এবং সি.পি.আই-এর নেতৃত্বে (P.W.L.F.) দুটি ফ্রন্ট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

→ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার স্বীকৃত হয়। বেনামি জমি উদ্ধার ও ভূমি সংস্কারের কাজ শুরু হয়।

→ কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে—জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ, খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ ও ভাগচাষি বা বর্গাদারদের ভাগের অংশবৃদ্ধি এই রকম কতকগুলি সংস্কারমূলক কাজে হাত দেয় ও রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারা প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

→ মার্চ মাসে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের চতুর্থ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। নির্বাচনের পরপরেই মহকুমা কৃষক সমিতির সম্মেলনের প্রস্তুতি নেওয়া হল। কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল তখন ছাড়া পেয়েছেন।

→ ১৮ মার্চ শিলিগুড়ি মহকুমা শাখার উদ্যোগে একটি কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মে মাসে নকশালবাড়ি আন্দোলন ঘটে।

→ শ্রমিক শ্রেণির ধর্মঘট, কৃষক বিদ্রোহ শাসকদের প্রভুত্বে ভাঙন ঘটায়।

→ জুন-জুলাই মাস ধরে নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি জুড়ে তৎপরতা বাড়তে লাগল কৃষক গেরিলা বাহিনী। যথেষ্ট জঙ্গি লড়াই তখন শুরু হয়ে গেছে।

→ শিল্পমন্দা কর্মসংস্থানের সুযোগকে নিদারুণ আঘাত করার ফলে যুবকদের হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটল বিভিন্ন বিস্ফোরণের মাধ্যমে।

→ ১৪ দলের যুক্তফ্রন্ট সরকার পুরো মেয়াদ সরকার চালাতে পারল না।

→ ২৮শে জুন, পিকিং রেডিও ঘোষণা করে 'ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের' নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার গ্রামাঞ্চলে কৃষক জনতার সশস্ত্র সংগ্রামের অধ্যায় শুরু হয়েছে।

১৯৬৮ → সমগ্র ৬৮/৬৯ সাল জুড়ে, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক খুনোখুনি চলতেই থাকে।

→ এই সালের শেষদিকে শুরু হয়ে গেরিলা লড়াই অব্যাহত থাকে এবং পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যা রাজ্যেও বিস্তার লাভ করে।

→ ডিসেম্বরে মাওলানা ভাসানি নির্বাচন বর্জনের আওয়াজ তোলেন।

→ ভিয়েতনামের ঘাতক প্রাক্তন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে কলকাতায় সারাদিন ব্যাপী বিক্ষোভে অংশ নিল প্রায় ৫০ হাজার ছাত্র।

→ ২১মে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলকে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উত্তাল সত্তর : পূর্বযাম

১৯৬৯ → ডিসেম্বর-মার্চ, পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন হয়। কৃষকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জোতদার, মহাজন, ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, মেম্বার প্রভৃতি শোষক নির্যাতকদের দুই একজন করে বিভিন্ন এলাকায় খতম করতে শুরু করে। গণ আন্দোলনের সময় পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই সালের শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তানের মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টি ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

→ নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের কথা ইতিমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অন্যান্য রাজ্যের সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের নেতারা—যাঁরা ইতিমধ্যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অবস্থান করছিলেন—নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতাদের সাথে বিশেষ করে চারু মজুমদারের সাথে যোগাযোগ করেন। তাঁরা মার্কসবাদী পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রথমে নিজেদের এলাকায় সমন্বয় কমিটি গঠন করেন। পরে নবগঠিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিতে যোগ দেন। [২]

→ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগেই নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছাত্রসমাজ প্রচারে নেমেছিল।

→ ১৪টি প্রধান অসরকারি ব্যাঙ্ক ইন্দিরা গান্ধি জাতীয়করণ করেন। এর প্রতিবাদে অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই পদত্যাগ করেন। ডিসেম্বরে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণমূলক আইন গৃহীত হয়।

→ ১৯-২১ এপ্রিল লেনিনের জন্মদিনে জন্ম নিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)। কংগ্রেস ভেঙে হয় ইন্দিরা কংগ্রেস বা নবকংগ্রেস এবং আদি কংগ্রেস।

→ ১লা মে মনুমেন্ট ময়দানে (শহীদ মিনার) পার্টিকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন কানু সান্যাল।

১৯৭০ → মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবীরা মে মাসে কলকাতার এক গোপন আস্তানায় পার্টি কংগ্রেসে সম্মিলিত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম ও তেলেঙ্গানায়, পাঞ্জাব, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের নক্‌শালবাড়ি ও বীরভূমে নতুনভাবে আবার সংগ্রামে সংগঠিত হতে থাকে।

→ পার্টি কংগ্রেসের দু'বছরের মধ্যে চারু মজুমদারের ঘোষিত নীতি ও কৌশল অনেকাংশে পরিমার্জিত হয়।

→ গোটা দশক ধরে রাজনৈতিক পার্টিগুলির বহু ভাঙন ধরেছে, গড়ে উঠেছে বিচিত্র ধরনের ঐক্য।

→ 'উগ্র' বামপন্থীদের বিরুদ্ধে এক বর্বর দমননীতি শুরু হয়।

→ হিংসাত্মক বহিঃপ্রকাশের ফলে ছাত্র-আন্দোলনের অবনতি এবং দৈন্যদশার প্রকাশ ঘটল।

→ নিয়ন্ত্রণমূলক আইন ১ জুন থেকে কার্যকরী হয়।

→ ১৬ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি পদত্যাগ করেন, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয়।

→ ১৭ মার্চ সি.পি.এম. বাংলা বন্‌ধ্‌ ডাকল। গোলমালে ৩১ জন খুন হয়।

→ ১৯ মার্চ রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরির আদেশে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।

→ মার্চ থেকে নকশালপন্থীরা শহরে অ্যাকশন শুরু করে।

→ ২ মার্চ প্রেসিডেন্সি কলেজে নকশালপন্থী ছাত্ররা অধ্যক্ষের ঘর তছনছ করে। অধ্যক্ষের ঘরে মাওসেতুঙের ছবি এঁকে দেয়। আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করে এদিন ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বিক্ষোভ দেখায়।

→ ১৬ এপ্রিল অ্যাকশন হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

→ ১৭ এপ্রিল জ্ঞান ঘোষ পলিটেকনিকে।

→ ২০ এপ্রিল আর.জি.কর. মেডিকেল কলেজ।

→ ২১ এপ্রিল পার্ক ইন্সটিটিউশন।

→ এরপর ছোঁয়াচে রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ল নকশালপন্থীদের শহুরে অ্যাকশন। কলকাতার দেওয়ালে লেখা হয় 'ঘটনা ঘটাও ফয়দা ওঠাও, শহরে চে, গ্রামে মাও'।

→ মে মাসে স্পেশাল ব্রাঞ্চে তৈরি হল নকশালপন্থী দমনে ভারপ্রাপ্ত বিশেষ সেল (Anti Nacalite Cell)।

→ ট্রেড ইউনিয়ন ভাঙল, ২৮-৩১মে কলকাতার রণজি স্টেডিয়ামে ডাকা হল সম্মেলন। সিটুর জন্ম হল। দুর্গাপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ।

→ শ্রমিক আন্দোলনকে প্রথমে সি.পি.আই (এম.এল) সমর্থন করল না। নকশালকর্মীরা দিশেহারা, পিকিং রেডিও দুর্গাপুর শ্রমিক আন্দোলনকে অভিনন্দন জানাল।

→ কলকাতায় নকশালপন্থীদের মিছিলে পঞ্চাশ হাজার লোক হয়েছিল। কলকাতা এবং আশেপাশে তখন প্রায় একলাখ মধ্যবিত্ত যুব ছাত্র নকশালপন্থী কর্মী হয়ে যান।

→ ২০-২১ জুলাই চারটি মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষা নকশালরা ভণ্ডুল করে।

→ ২৭ জুলাই বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রধর্মঘট ডেকেছিল।

→ ১২-১৩ আগস্ট দুর্গাপুরে সিটুর ডাকে শ্রমিক ধর্মঘট ও লড়াই।

→ ১৯ আগস্ট ফাঁসিদেওয়ায় গ্রেফতার হলেন কানু সান্যাল।

→ ২৫ আগস্ট দুর্গাপুরে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি ধর্মঘট ডেকেছিল।

→ ১৭ সেপ্টেম্বর এক সরকারি আদেশে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় সন্ত্রাসবাদী হামলা দমন আইন যাকে বলা হত চার্লস টেগার্টের আইন, তা চালু করা হয়েছিল।

→ ইন্দিরা কংগ্রেস নকশাল নিধন শুরু করেছিল।

→ ৩০ আগস্ট থেকে কলকাতা, ব্যারাকপুর, কৃষ্ণনগর, হুগলি, বর্ধমানে মিলিটারি টহল শুরু হয়।

→ ২৭ অক্টোবর মহাকরণে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের ক্রাইম কন্‌ফারেন্সে মুখ্য সচিব বলে দেন পুলিশ গুলি চালালে কোনোরকম প্রশাসনিক তদন্ত হবে না।

উত্তাল সত্তর : উত্তরযাম

১৯৭১ → ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার বামপন্থাবিরোধী অবস্থান নেয়। কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাঙন। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের গতিবেগ এই সময় অনেকটা থিতিয়ে যায়। কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তখন পরস্পর লড়াইয়ে ব্যস্ত।

→ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। মাসিক ১০০ টাকা বেতনে প্রতিটি জেলায় বছরে দশমাস ১০০ জন কাজ পাবে, রাস্তাঘাট, সেচ ব্যবস্থা ও ভূমির উন্নয়ন ঘটানো হবে।

→ জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই লোকসভা ভোট। ইন্দিরা গান্ধি ফের প্রধানমন্ত্রী হলেন। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গিয়েছিল। ছাত্র পরিষদের রমরমা শুরু হয়। সবুজ বিপ্লবের ফলে দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়ে।

→ অক্টোবরে কোচিনে সি.পি.আই-এম কংগ্রেসে সমস্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের সমাবেশ ঘটানোর আহ্বান জানানো হয়।

→ মার্চ-এপ্রিল-মে-জুন মাসে খুনোখুনি লেগেই ছিল। কলকাতায় ও আশেপাশের জেলাগুলিতেই এর আঁচ ছিল বেশি।

→ মার্চ-ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় সাড়ে আট হাজার নকশালপন্থী গ্রেফতার হয়েছিল।

→ অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বাধীন ডেমোকোয়া সরকার মাত্র তিন মাস টিকেছিল। তারপর সরকারের পতন হয়। বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়। রাজ্যে তৃতীয় বারের (প্রথম বার ২৮-২-১৯৬৮, দ্বিতীয় বার ১৭-৩-১৯৭০) রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়।

→ জুন মাসে বাসে ট্রামে কনশেসনের দাবিতে ছাত্র পরিষদ আন্দোলন শুরু করে।

→ ৪ জুলাই বরানগরের রবীন্দ্র ভবনে কংগ্রেস, সি.পি.এম., আর.এস.পি., এস.ইউ.সি. সবাই মিলে খুনোখুনি ও সন্ত্রাস বন্ধে নাগরিক সম্মেলন ডাকে।

→ ১৯ জুলাই মহাকরণে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। একটা সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন। ভেঙে দেওয়া বিধানসভার ১৮টি রাজনৈতিক দলকে সেখানে ডাকা হল।

→ মার্চ-জুলাই পর্যন্ত সি.পি.আই. (এম.এল) দলের অ্যাকশন, লাল সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা তুঙ্গে ওঠে। আগস্ট থেকে অ্যাকশন কমতে থাকে। চারু মজুমদার তখন কটকে আত্মগোপন করেছিলেন।

→ মার্চ মাসে রামপুরহাট এলাকায় পুলিশের থেকে প্রথম রাইফেল ছিনতাই করার পর জোতদার ও পুলিশের থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম শুরু হয়।

→ ১৫ জুলাই পর্যন্ত নকশালপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে ১৬৯৬টি অ্যাকশন করেছে, অন্ধ্রে ৩৭৩, বিহারে ১৫২টি।

→ সিংহলে 'জনতা ভিমুক্তি পেরুমানা'-র নেতৃত্বে সিংহলী যুবকগণ বিদ্রোহ করেছিল।

→ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের পেটি বুর্জোয়া যুবকগণ তখনকার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

→ মার্চ মাস থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়।

→ ৭ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদের ভোট হয়, পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্ত শাসনের দাবীদার আওয়ামি লিগ ভোটে জেতে। পশ্চিম

পাকিস্তানে জেতে ভুট্টোর পিপলস্ পার্টি। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামি লিগের জয়কে মানতে চাননি পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান। জানুয়ারিতে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার ভুট্টোর সাথে চক্রান্ত করে আওয়ামি লিগ সরকারকে ক্ষমতার বাইরে রাখা ও পূর্ব পাকিস্তানকে কোনওরকম সুবিধা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচিত গণপরিষদের অধিবেশন বাতিল করেন। এরফলে পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় ব্যাপক বিক্ষোভ। ২ মার্চ স্থগিতাদেশের প্রতিবাদে ঢাকায় হরতাল হয়। পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় গণ আন্দোলন।

→ ৪ মার্চ পূর্বপাকিস্তানে পথযুদ্ধে ১০০ জন নিহত হয়। পরদিন ঢাকায় সৈন্যদের গুলিতে ২০০০ লোক নিহত হয়।

→ ৭ মার্চ আন্দোলনের নেতা মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন, শুরু হবে কর বন্ধ আন্দোলন, মুজিবরের দাবি ছিল—

(ক) সৈন্যদের বারাকে ফিরে যেতে হবে।

(খ) নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে।

(গ) হত্যার তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

→ ১৫ মার্চ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন—২৫ মার্চ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়ে গেল। ইয়াহিয়া খান আওয়ামি লীগকে নিষিদ্ধ করে দেন।

→ ২৫ মার্চ সামরিক বাহিনীর আক্রমণের পর লীগ নেতা মুজিব সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

→ ৩১ মার্চ বাংলাদেশের লড়াইয়ের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গে হরতাল হয়েছিল। কিসিংগার পিকিং এ তার বিখ্যাত গোপন ভ্রমণ সারলেন। ভারত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করল।

→ এপ্রিল-ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি সহ 'পিকিং পন্থী' নামে পরিচিত বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির নেতৃত্বে কয়েকটি জেলায় হাজার হাজার 'শ্রেণিশত্রু খতম' করা হয়েছিল।

→ ১৩ মার্চ আত্মগোপন করা অবস্থায় মারা যান সুশীতল রায়চৌধুরী।

→ ডিসেম্বরে পাকিস্তান বিভাজন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সহায়তা দান। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতের অনুকূলে সফল পরিসমাপ্তি।

→ ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী ও তার দালাল রাজাকার বাহিনী শুরু করে অত্যাচার, হাজার হাজার পূর্ববঙ্গবাসী অত্যাচারের ফলে এপারে এসে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়।

→ ১৬ মে, ৫ জুন ইন্দিরা গান্ধি ওপার বাংলা থেকে আসা শরণার্থীদের শিবিরগুলি ঘুরে দেখেন। বলেন—'আমরা গরিব হতে পারি তবে শরণার্থীদের সেবা করতে পিছুপা হব না'।

→ মুক্তিযুদ্ধের পর, ইন্দিরা গান্ধিকে বলা হয় 'এশিয়ার মুক্তি সূর্য'।

→ মে মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এপারে সি.পি.আই. (এম.এল.) দলের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। মতবিরোধের একদিকে ছিলেন চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত অন্যদিকে ছিলেন অসীম চ্যাটার্জী, সন্তোষ রাণার নেতৃত্বাধীন বাংলা বিহার ওড়িশা সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটি (BBOBRC)। মতবিরোধের বিষয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন নিয়ে মহম্মদ তোহার নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) লাইন কী হওয়া উচিত।

→ এ সালেই প্রকাশিত হয় ম্যাক্সওয়েলের বই 'ইন্ডিয়া'জ চায়না ওয়ার'—সারা পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন তোলে বইটি।

→ কেন্দ্রীয় সরকার ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়। ব্যক্তিগত জমির সিলিং হ্রাস করা হয় এবং দেশের অর্থনীতির পীঠস্থান বেশ কিছু সংস্থাকে সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে আনে।

১৯৭২ → বৃষ্টিপাতের অপ্রতুলতা, মূল্যবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংকট। ডিসেম্বরে কংগ্রেসের অধিবেশন, বহুসমারোহে কলকাতায় ২৮শে জুলাই পুলিশ হাজতে মৃত্যু চারু মজুমদারের। কলকাতা শহরাঞ্চলে ছাত্র ও যুবকদের কালাপাহাড়ি বিক্ষোভের অবসান। কৃষক সংগ্রামের পরাজয়। এসবের সঙ্গে নকশালবাড়ি আন্দোলনের একটা পর্যায় শেষ হয়।

→ ৭২-এর নির্বাচনে ইন্দিরাগান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় ভালোরকম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ

ক্ষমতা নিয়ে ফিরে আসে। নকশালবাড়ির আগুন তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে।

নিস্তব্ধ সত্তর : সূর্যাস্তের পর

১৯৭৩ → আরব-ইজরাইল যুদ্ধ। সুয়েজ যুদ্ধ তৈল সমস্যার সূচনা করল। মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সংকট বিশ্বের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে ফেলেছিল। ভারতের অর্থনীতিতে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

→ নকশালবাড়ি ডোবরা-গোপীবল্লভপুর অথবা বীরভূমের কয়েকটি এলাকাতে জোতদার মহাজন পুলিশ খতম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

১৯৭৪ → রেল ধর্মঘট ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনে এক নজিরবিহীন ইতিহাস।

→ সত্তর দশকের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। '৭২ সালে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গণ-অসন্তোষের সূত্রপাত হয় তা ১৯৭৪এ তুঙ্গে ওঠে এবং নতুন শক্তি সমাবেশ ও বিন্যাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়। '৭৩ সালের পর থেকে কৃষকেরা নতুনভাবে আরও জমি দখল ও ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ, বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ ও তাদেরকে জমিতে দখলীস্বত্ব ও ফসলের তিন চতুর্থাংশ প্রদানের দাবিতে কৃষকসভার নেতৃত্বে দ্রুত সংঘটিত হতে শুরু করে।

→ বোনাস অর্ডিন্যান্স জারি হয়। শ্রমিকদের মজুরি সংকোচন করা হয়েছিল। কংগ্রেস সমর্থক কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এ.আই.টি.ইউ.সি.-এর বিরোধিতা করে শেষ পর্যন্ত।

→ জানুয়ারি মাসে গুজরাটের আমেদাবাদ ও মোরভির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির ছাত্রবিক্ষোভ গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। মার্চ মাসের মাঝামাঝি অসংখ্য ব্যক্তি গ্রেপ্তার এবং অন্তত ১০০ জন নিহত হন।

→ গুজরাট সরকারের পদত্যাগের দাবি মেনে নেন ইন্দিরা গান্ধি।

→ ১৮ মার্চ পাটনায় বিভিন্ন কলেজে বিক্ষোভ। নির্বিচারে জনগণের ওপর আক্রমণ ও গুলি চলে।

১৯৭৫ → ২৫শে জুন অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। শ্রমিক সংগঠনগুলো প্রায় অকেজো হয়ে যায়।

→ ৭৫-৭৬-এর মধ্যবর্তী সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের ফলে গিনি বিসাউ এবং মোজাম্বিকের জন্ম হল।

→ কয়েকমাস রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝা চরমে ওঠে।

→ ২ জানুয়ারি রেলমন্ত্রী এল.এন. মিশ্র বোমার আঘাতে আহত হন এবং মারা যান।

→ জয়প্রকাশের আবির্ভাব, দক্ষিণপন্থী বিরোধী পার্টিতে জোয়ার আসে।

→ 'গরিবি হঠাও', 'সবুজ বিপ্লব', 'সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা', 'কায়েমি স্বার্থের বাধা' কংগ্রেসের এইসব শ্লোগানের বিফলতা।

১৯৭৬ → জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের ব্যাপক গণতান্ত্রিক ঐক্য।

→ মাও সে তুঙ-এর মৃত্যু এবং চীনে আলোড়ন।

উদ্‌ভ্রান্ত সত্তর : অরুণোদয়

১৯৭৭ → মার্চে লোকসভা নির্বাচন। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার। নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসের পরাজয় ও জনতা পার্টির আবির্ভাব, আবার ভারতীয় শাসক শ্রেণির মধ্যে কোন্দল। অবস্থানের পুনর্বিন্যাস। লোকসভা নির্বাচনে ইস্যু হয়ে উঠল গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্র। সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ও কেন্দ্রে প্রথম অকংগ্রেসি সরকার প্রতিষ্ঠিত হল।

১৯৭৮ → ২৫শে ডিসেম্বর ভিয়েতনাম বাহিনী তার পূর্ব সহযোগী এবং আশ্রয়স্থল কামপুচিয়ায় শুরু করল ব্যাপক আক্রমণ এবং অবিমিশ্র রূপ সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠা করল হেং সামরিনের শাসন।

→ ৭৮-৭৯ সালে বিহারে হরিজনদের জন্য চাকুরিতে স্থান সংরক্ষণ নিয়ে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা।

→ ৭৮-৭৯ ভয়াবহ বন্যা, কৃষি মজুরি, উৎপাদন, গ্রামীণ অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।

১৯৭৯ → এই বছরের শেষে আবার নির্বাচন।

→ ৭৭-৭৯-র মধ্যে ঘটেছে চল্লিশটি জাতি দাঙ্গা।

১৯৮০ → পুনরায় কংগ্রেসের আগমন।

‘সত্তরের দশক আমাদের যা দিয়েছে তা সমগ্র দেশকেই দিয়েছে’—
কী দিল সত্তর দশক!

সত্তর দশক হল এমন একটা পর্ব, যা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব—পশ্চিম ইউরোপের ধারাবাহিক ছাত্র বিক্ষোভ আর সমকালীন রাজনৈতিক দলগুলির আপসমুখী, সুযোগসন্ধানী চিন্তাধারা সত্তর দশককে বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আধার বা ‘ধারণ-সময়ে’ পরিণত করেছিল। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে সত্তর দশক সবচেয়ে তাৎপর্যময় সময় আবার অন্য ভাবেও বলা যায়, সত্তর দশকের ঘটনাগুলিকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছিল কমিউনিস্ট আন্দোলন। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ধীরে ধীরে দুটি পরস্পর-বিরোধী প্রবণতা গড়ে ওঠে। একটি ‘পার্টি নেতৃত্বের নির্বাচনমুখী সংসদ-সর্বস্ব রাজনীতি’ আর একটি ‘কমিউনিস্ট কর্মী বাহিনীর সংগ্রামমুখী বিপ্লবকামী রাজনীতি। চীনের ভারত আক্রমণকে কেন্দ্র করে তখন কমিউনিস্টদের বলা হত দেশদ্রোহী, চীনের দালাল। কমিউনিস্ট পার্টিতে দুটি মত তৈরি হয়, একদিকে এস.এ. ডাঙ্গের নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের দক্ষিণপন্থী জাতীয় পরিষদ এঁরা স্তালিনবিরোধী, ক্রুশ্চেভপন্থী, চীন সোভিয়েত মহা বিতর্কে তাঁরা সোভিয়েতপন্থী; সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অধিকাংশই ছিলেন এই দিকে, এঁরা চীনকে আক্রমণকারী মনে করেন এবং নেহেরু সরকারের পক্ষ নেন। অন্যদিকে মজফ্‌ফর আহমদের নেতৃত্বের কমিউনিস্টদের বামপন্থী অংশ চীনকে আক্রমণকারী বলে মানতে চায় না। চীন যেহেতু কমিউনিস্ট শাসিত দেশ সে-কারণেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এই ভাঙন। এই সময় নেহেরু-সরকার বেছে বেছে কমিউনিস্টদের বিনা বিচারে জেলে বন্দী করতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন অনেক প্রাদেশিক নেতৃত্বের সাথে গ্রেফতার করা হয় দার্জিলিং জেলার কমিউনিস্ট নেতা চারু মজুমদার, কানু সান্যাল এবং কলকাতার সরোজ দত্ত, সুশীতল রায়চৌধুরী প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের।

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী অংশের সকলেই ছিলেন বিপ্লবকামী সংগ্রামমুখী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। এরা মূলত র‍্যাডিক্যাল, বিপ্লবকামী কমিউনিস্ট। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, নিরঞ্জন বসু, মণি গুহ, অমূল্য সেন, সরোজ দত্ত, সুনীতি কুমার ঘোষ, পরিমল দাশগুপ্ত, অসিত সেন, বনবিহারী চক্রবর্তী, সৌরেন বসু, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ। এঁরা ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও মাও জে দঙের বিপ্লব-কেন্দ্রিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। সি.পি.আই.-এর এই বামপন্থী অংশের মধ্যেই কিন্তু সেদিন অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আগামীদিনের নকশালপন্থী বা মাওপন্থী কমিউনিস্টরা। এই দল ‘কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া’র

সঙ্গে ব্রাকেটে (M) অর্থাৎ Marxist কথাটি যোগ করেন। তাঁরা সি.পি.আই নেতৃত্বের সংসদ-সর্বস্ব রাজনীতির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজিত হয়ে হল C.P.I. আর C.P.I. (M-L)। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট)।

'শোধনবাদ' শব্দটি সত্তর দশকের রাজনৈতিক ইতিহাসে আনল এক নতুন অভিঘাত। সেদিনের সি.পি.আই.-এর বামপন্থী অংশের মধ্যেই ছিল দুটি ধারা সি.পি.আই.(এম) আর নকশালপন্থীরা। সি.পি.আই.(এম) নকশালবাড়ি-বিরোধী রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। সি.পি.আই.(এম) এর উল্লেখযোগ্য নেতা হলেন—প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিনয় চৌধুরী, মুজফ্ফর আহমদ, সমর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মূলত C.P.I.(M)-এর পরিচয় ছিল সংসদ-কেন্দ্রিকতার বিরোধী, সংগ্রামমুখী, বিপ্লবকামী দল হিসাবে। সংশোধনবাদ বিরোধী কর্মসূচিও এই দলে গৃহীত হত। শুরুতে এই দল ছিল বিপ্লবকামী দল। বিপ্লবকামী মানুষ C.P.I.(M)-এর সম্পর্কে ছিল আশাবাদী। কিছুদিনের মধ্যেই আবার সি.পি.আই.(এম) এর ভেতরে দেখা গেল অন্তর্দ্বন্দ্ব। বহু গোষ্ঠীর জন্ম হল এর থেকে। চলতে থাকল আন্তঃপার্টি মতাদর্শগত সংগ্রাম। সংশোধনবাদ-বিরোধিতার কথা বললেও C.P.I.(M) কিন্তু সংসদীয় রাজনীতিতেই আবদ্ধ ছিল। সি.পি.আই. এর মতো সি.পি.আই. (এম) শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাস হারিয়ে শ্রেণি-সমঝোতার পথ অনুসরণ করে নির্বাচনকেই বেশী গুরুত্ব দিল। C.P.I.(M) 'নয়াসংশোধনবাদী বলে সমালোচিত হল। 'মেকী বামপন্থী'দের সঙ্গে 'প্রকৃত বামপন্থী'দের মতাদর্শগত সংগ্রাম চলতেই থাকল। চীনের পথকে ভারতের বিপ্লবের পথ বলে মনে করা হল। এই সময়েই চারু মজুমদার তাঁর আন্তঃপার্টি মতাদর্শগত দলিলগুলি লেখেন। ছাত্রফ্রন্টের সঙ্গে সি.পি.আই.(এম) এর নেতৃত্বাধীন বি.পি.এস.এফ এর মতাদর্শগত সংগ্রাম চলে। ছাত্রফ্রন্টের সদস্য ছিলেন শৈবাল মিত্র, আজিজুল হক, দীপক বিশ্বাস, নির্মল ব্রহ্মচারী, অসিত সিন্‌হা, দিলীপ পাইন প্রমুখ।

১৯৬৪ সালের প্রথম দিকে ইনস্টিটিউট অফ মার্কসিজম-লেনিনিজম গড়ে উঠেছিল। ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে গড়ে ওঠে 'শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কমিটি'। এরই পরবর্তী নাম 'আন্তঃপার্টি শোধনবাদ বিরোধী সংগ্রাম কমিটি'। এরপর খাদ্য আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছাত্রফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে কেন্দ্র করে আন্তঃপার্টি মতাদর্শগত সংগ্রাম জটিল রূপ ধারণ করে। জন্ম হয় বহু গোষ্ঠীর; বহু পত্রপত্রিকা এবং গোপন দলিলের। এগুলির মধ্যে দুটি ধারা লক্ষ করা যায়—একটি 'বিতর্কপন্থী ধারা' যার প্রধান প্রবক্তা অসিত সেন, সুশীতল রায়চৌধুরী, পরিমল দাশগুপ্ত প্রমুখ; আর একটি 'প্রয়োগপন্থী ধারা' যার প্রধান প্রবক্তা চারু মজুমদার। বিতর্কপন্থীদের

লক্ষ্য হল সি.পি.আই.(এম) নেতৃত্বের নয়া সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া আর 'প্রয়োগপন্থী'দের লক্ষ্য—বিকল্প বিপ্লবী প্রয়োগের মাধ্যমে শোধনবাদ বিরোধী সংগ্রাম চালানো। 'প্রয়োগপন্থীরা' জোর দেয় শুধু দলিল রচনা নয়, বাস্তব প্রয়োগ গড়ে তোলার ওপর। তাই চারু মজুমদারএবং তাঁর সহযোগী দল উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে জঙ্গি কৃষক আন্দোলন শুরু করেন। সশস্ত্র কৃষক বিপ্লবীদের সংগ্রাম গড়ে ওঠে।

কংগ্রেসি শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য আন্দোলন এবং বন্দীমুক্তি আন্দোলনের প্রভাবে কংগ্রেস-বিরোধী গণরোষ তীব্রতর হয়ে ওঠে। কংগ্রেস শাসক দলের বিরুদ্ধে তখন দুই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দুটি আলাদা মোর্চা বা ফ্রন্ট গঠিত হয়। সি.পি.আই. এর 'প্রগতিশীল সংযুক্ত বামফ্রন্ট' (P.W.L.F) আর সি.পি.আই.(এম) এর 'সংযুক্ত বামফ্রন্ট' ১৯৬৭-র ১৯ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের ফল বাংলা কংগ্রেসের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেয়। 'বাংলা কংগ্রেসের' নেতৃত্ব হলেন অজয় মুখোপাধ্যায় ও হুমায়ুন কবির। এঁরা কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। একক বৃহত্তম কংগ্রেস দল, সরকার গঠনে রাজি হল না। জনগণের প্রবল বিরোধী মনোভাব ছিল বর্তমান। দ্বিতীয় বৃহত্তম দল সি.পি.আই.(এম)। অকংগ্রেসি বিরোধী দলগুলির কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য সি.পি.আই.(এম)কে প্রয়োজন। কিন্তু সি.পি.আই.(এম) নির্বাচনের আগে ছিল সংসদ-সর্বস্ব রাজনীতির বিরোধী। তবে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বৈঠকের পর সি.পি.আই.(এম) অকংগ্রেসি সরকারকে সমর্থন জানায় এবং সরকারে সক্রিয়ভাবে যোগদানে আগ্রহী হয়ে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী পদ প্রার্থী হিসাবে অজয় মুখার্জির নাম স্থির করা হয়। এই সরকারে যোগ দেওয়া মন্ত্রীত্ব গ্রহণের ব্যাপারে পার্টির বিপ্লবী কর্মীদের ভেতর যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয়। পার্টির মুখপাত্র 'দেশহিতৈষী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই সক্রিয় বিপ্লবী কর্মী গোষ্ঠী সরব হয়ে ওঠেন। এই বিপ্লবী কর্মীগোষ্ঠীর অনুপ্রেরণা ছিল চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নায়ক মাও-সে-তুং-এর বিপ্লবী মতাদর্শ। 'দেশহিতৈষী' পত্রিকার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে পার্টি নেতৃত্বের বিরোধ চলতে থাকে।

> ''যে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পার্টি নেতৃত্ব সরকারে যাবার সিদ্ধান্ত নেন সেই তারিখেই বেরোয় 'দেশহিতৈষী'-র ৪র্থ বর্ষ, ২৭তম সংখ্যা। সেখানে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও রেড গার্ডদের সম্পর্কে একটি অনুবাদ রচনা 'রেডগার্ডস' প্রকাশিত হয়। তাছাড়া চীনের গণমুক্তি ফৌজের মুখপত্র লিবারেশান আর্মি ডেইলী-র ২৫শে জানুয়ারীর সম্পাদকীয়র পূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হয় (পৃ. ৮-৯)। 'দেশহিতৈষী'তে এই লেখাটির শিরোনামা ছিল 'চীনের গণমুক্তি ফৌজ দৃঢ়ভাবে প্রলেতারিয়ান সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সমর্থন করে।'' [৩]

দেখা যাচ্ছে 'দেশহিতৈষী'কে কেন্দ্র করে মতাদর্শগত সংগ্রাম চলতে থাকে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর, পার্টির বিপ্লবী অংশের মধ্যে ধীরে ধীরে উগ্র মনোভাব দানা বাধতে থাকে।

দেশহিতৈষী কেন্দ্রিক এই বিপ্লবী অংশের উল্লেখযোগ্য কমিউনিস্টরা হলেন—সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, নিরঞ্জন বসু প্রমুখ।

এরপর পার্টির সর্বদলীয় বৈঠকে স্থির হয়, দুই ফ্রন্ট তুলে দিয়ে বিধানসভায় একটাই ফ্রন্ট হবে আর তার নেতা হবেন অজয় মুখার্জী। ১৯৬৫ সালের শেষ দিকে সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, অসিত সেন, পরিমল দাশগুপ্ত প্রমুখেরা গড়ে তোলেন 'শোধনবাদ বিরোধী সংগ্রাম কমিটি' সর্বদলীয় বৈঠকের পর এই কমিটি প্রকাশ করল একটি দলিল যার শিরোনাম 'সংস্কারবাদী নেতৃত্বের হাত থেকে পার্টিকে বাঁচান'। এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল র‍্যাডিকেল কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ করা। এই পার্টিকেই বলা হয় 'নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের পার্টি'। উত্তরবঙ্গের বিপ্লবী কৃষক কমিটি নেতা চারু মজুমদার আবার এই কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সৌরেন বসু শিলিগুড়ির প্রতিনিধি হিসাবে এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত হন। এই কমিটি মূলত কলকাতা ও কলকাতার শহরতলি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে সক্রিয় ছিল। চারু মজুমদার বিকল্প বিপ্লবী প্রয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন আর এই কমিটি মূলত আন্তঃপার্টি বিতর্কমূলক মতাদর্শগত সংগ্রামে ব্যস্ত ছিল। গ্রাম বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদের কোনও সংযোগ ছিল না।

এইসময় ছাত্রফ্রন্টেও সংসদ-সর্বস্ব, সরকার-কেন্দ্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ তীব্র হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রতি তারা আস্থা হারাতে থাকে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের আগে থেকেই প্রেসিডেন্সি আন্দোলনকে ঘিরে সংগ্রামরত ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে তারা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হতে থাকে এবং উগ্রপন্থী বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। পরে অবশ্য নির্বাচনের প্রয়োজনেই পার্টি এই বহিষ্কৃত ছাত্রদের ফিরিয়ে নিতে চায়। কলকাতার ছাত্র আন্দোলনের নেতা হয়ে ওঠেন অসীম চট্টোপাধ্যায় বা কাকা। নির্বাচনের পর নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর ছাত্র সংঘগুলির প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলিকে নাকচ করার প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৬৭-র নির্বাচন ঘোষণার পরই, ট্রাম, বাস ও ছাত্র আন্দোলনগুলিকে বেশ সক্রিয়রূপে দেখা যায়। বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনে দুটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। একটির নেতৃত্বে ছিল বিক্ষুব্ধ বামপন্থী ছাত্রকর্মী যাঁরা মাও সে তুঙ এর চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন শৈবাল মিত্র, আজিজুল হক, নির্মল ব্রহ্মচারী প্রমুখ। এঁদের প্রকাশিত পত্রিকা হল 'ছাত্রফৌজ'। আর একটি ছাত্রকর্মী কেন্দ্র হল 'প্রেসিডেন্সী কনসলিডেশন' জঙ্গি এস.এফ. গোষ্ঠী। এর নেতৃত্ব হল অসীম চট্টোপাধ্যায়, দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী, রণবীর সমাদ্দার প্রমুখ।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরাট পরাজয় এবং পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে চীনের হস্তক্ষেপে পার্টির বিপ্লবী অংশ মনে করে পার্টি সংশোধনবাদের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং পার্টির নিম্নস্তরে মতভেদ আরও স্পষ্ট হয়। (সি.পি.আই.(এম) এর কেন্দ্রীয় নেতা

ছিলেন ই.এম.এস. নাম্বুরিপাদ) নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর বিরোধ আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়, তার কারণ কেরালায় আর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠনের ঘটনা। দক্ষিণবঙ্গে তখন বিতর্কমূলক আন্তঃপার্টি মতাদর্শগত সংগ্রাম চলছিল আর উত্তরবঙ্গে চারু মজুমদারদের নেতৃত্বে 'বিপ্লবী প্রয়োগভিত্তিক সংশোধনবাদ বিরোধী' পার্টি বিভিন্ন এলাকায় কৃষক আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছিল। তীব্র খাদ্য সংকটের ফলে খাদ্যশস্য লুঠ, মজুত উদ্ধার ও ঘেরাও এর ঘটনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৩রা মার্চ নকশালবাড়ি থানার বড়ামনিরাম জোতে সশস্ত্র ভাগচাষীরা জোতদারদের ধান লুঠ করল। তরাই অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল। বিভিন্ন চা বাগানে এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করেছিল। চাবাগান শ্রমিক নেতৃত্বের একটা বড় অংশ কৃষক ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। কৃষকদের শ্লোগান ছিল—'কৃষক সব জোট বাঁধো, আপন হাতে রাজ নাও'। দুবছর ধরে চারুমজুমদার তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রচার চালিয়েছিলেন, দলিল রচনা করেছিলেন। এই সময়ে সি.পি.আই.(এম) এর কেন্দ্রীয় কমিটি উত্তরবঙ্গের বিপ্লবী কমিউনিস্টদের 'অতি-বামপন্থী' ও 'হঠকারী' কার্যকলাপের সমালোচনা করে। বিপ্লবী কমিউনিস্টরা নির্বাচন থেকে দূরে গিয়ে তাদের নিজস্ব পথে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যায়, 'এলাকা ভিত্তিক ক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম' চলতে থাকে। বেনামি ও বেআইনিভাবে লুকানো জমি উদ্ধার করা, উঠতি জমি বিতরণ করা, উচ্ছেদ বন্ধ করা, প্রগতিশীল ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা করা, ন্যায়সঙ্গত মূল্যে খাদ্য সরবরাহ, ন্যায্য মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বন্টন, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সেচ ও জলনিকাশি ব্যবস্থা, সার, ক্যানেল কর প্রভৃতি বিষয়ে কৃষকদের চাহিদা, ঋণ ও রিলিফের ব্যবস্থা এবং ক্ষেতমজুরদের কাজ ও বাঁচার মতো মজুরি প্রভৃতি জরুরি দাবিগুলি নিয়ে কৃষক সমিতি সংগঠতি ও সুসংবদ্ধ আন্দোলন করে। তবে কৃষক সমিতির এই আন্দোলন পার্টি নেতৃত্ব বা প্রাদেশিক কৃষকসভার নেতৃত্বের সমর্থন পেল না। কিন্তু কৃষকসভা মিছিল ও বিক্ষোভ চালিয়ে যায়। তাঁরা স্থানীয় ধনী জোতদারদের মধ্যে ভয় সঞ্চার করে।

> ''১৯৬৭-র ঐ সময়টায় নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়ার চাষীরা তখন তৈরি হচ্ছিলেন একটা বড় কিছু করার জন্যে। জমি ছিল এক ফসলী অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটার পর আষাঢ়ে বৃষ্টি না নামা পর্যন্ত তখন মাঠে কাজ থাকত না। নির্বাচনের সময় থেকেই চলতে থাকে প্রচার। চৈত্র-বৈশাখের চড়া রোদে গ্রামে গ্রামে বসল চাষীদের বৈঠক। নেতারা বললেন, অনেক সহ্য করেছি আর নয়। এবার তরাই জেগে উঠবে। রাত দুটো পর্যন্ত চাষীদের সভা। তাড়ি ছেড়ে চাষীরা তৈরি করতে লাগল তীর ধনুক, জোতদারদের নাম শুনলেই চাষীরা ঘেন্নায় থু থু ফেললেন, কিষাণ চ্যাটার্জীর মত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররা ক্যারিয়ারের মোহ ছেড়ে চাষীদের সঙ্গে মেশার জন্য নকশালবাড়ির গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন। চা বাগানের শ্রমিকরাও বুঝলেন ঝড় আসছে।'' [৪]

মার্চের প্রথম থেকেই নকশালবাড়ি অঞ্চলে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ চলতে থাকে। অগ্নি সংযোগ, লুঠতরাজ ও জমি দখলের ঘটনা ঘটতে থাকে। খবরের কাগজের রিপোর্ট থেকে জানা যায় প্রথম দিকে সরকার পক্ষ জানিয়েছে 'গণতান্ত্রিক ও মেহনতি মানুষের আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না।' কিন্তু কোনও লিখিত নির্দেশ দেওয়া হয় না। একটি তথ্য থেকে জানা যায় '৯ই মার্চ থেকে ২২শে মে পর্যন্ত সময়ে পুলিশের কাছে ১০০টি সংঘর্ষের ঘটনার রিপোর্ট আসে কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিষেধের ফলে ইচ্ছে থাকলেও পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে পারেনি' আরও জানা যায়—৩-১৭ই মার্চ সময়ের মধ্যে প্রায় ৬০টি জমি দখলের ঘটনা ঘটেছিল এবং জোতদাররা প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছিল। নকশালবাড়িতে ঘটে যাওয়া ৩ মার্চ এর ঘটনা সম্পর্কের্র বিভিন্ন জায়গা থেকে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। যেমন—এইদিন

> ''একদল কৃষক নকশালবাড়ি থানা অঞ্চলে একটা জমির চারপাশে লাল পতাকা পুঁতে ঘোষণা করেন, এই জমির ধান তাদের কারণ জমিটা জোতদারের নয়। এবং ফসল কাটতে শুরু করে।'' [৫]
>
> ''ঐদিন চারু মজুমদারের অনুগামীদের দ্বারা পরিচালিত একদল কৃষক তীর ধনুক বর্শা ও লাঠি নিয়ে জমি দখল করতে আসেন। তাঁরা লাল পতাকা পুঁতে দিয়ে জমি চিহ্নিত করেন। ঘোষণা করেন যে এই জমির মালিক হল কৃষক সভা...
>
> আর একটি সূত্র জানাচ্ছে যে, ঐদিন (৩রা মার্চ) নকশালবাড়ি থানার বড়ামনিরাম জোতে দুই জোতদার জয়ানন্দ সিং এবং গাইসু সিং এর বাড়ি থেকে প্রায় শ দেড়েক লোক প্রায় ৩০০ মন ধান জোর করে নিয়ে যান। এঁদের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন ঐ দুই জোতদারেরই আধিয়ার (ভাগচাষী)। এঁদের সাথে ছিল লাঠি, বর্শা, তীর ধনুক আর সি.পি.আই.এম. পার্টির পতাকা।
>
> ... ...
>
> উত্তর প্রদেশের পুলিশ প্রধান, বি.এস.এফ.-এর পরিচালক ও বিশিষ্ট আই.পি.এস. অফিসার প্রকাশ সিং নকশাল আন্দোলনের উপর রচিত তাঁর গ্রন্থে আন্দোলনের সূচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে ৩রা মার্চ তিনজন ভাগ-চাষী লাপা কিষাণ, সাঙ্গু কিষাণ এবং রতিয়া কিষাণ শ'দেড়েক সি.পি.আই.(এম) সমর্থককে নিয়ে জোতদারদের বাড়ি চড়াও হন। তাঁদের সাথে ছিল লাঠি ও তীর-ধনুক। তাঁরা পার্টির পতাকা বহন করছিলেন। তাঁরা জোতদারদের শস্যের গোলা থেকে ৩০০ মন মজুত ধানের প্রায় সবটাই তুলে নিয়ে যান। জোতদারকে ঐ ধানের থেকে কোন ভাগ তাঁরা দেননি।'' [৬]

পরবর্তী দুমাসে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া থানার পরিচালিত গ্রামগুলিতে এরকম বেশ কিছু ঘটনা ঘটে। ১৮ইমার্চ চারটে এলাকার কৃষক সংগঠকরা সম্মেলনে বসেন, চার

মাস ধরে তাঁরা প্রস্তুত হন। অকংগ্রেসি যুক্তফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কারের কথা ঘোষণা করে তখনই। বিপ্লবী কৃষকরা এসব কথা না শুনে নিজেদের কমিটি তৈরি করে জোতদারদের জমির হদিশ খুঁজে বার করতে শুরু করে এবং সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে। লাঠি-সড়কি-তীর ধনুক আর লাল পতাকা নিয়ে হাজার হাজার কৃষকের মিছিলে গ্রামাঞ্চল কাঁপতে থাকে। নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়াতে একের পর এক কৃষকবিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। পুলিশ বা সরকার পক্ষ প্রথম প্রথম কিছু করল না, মনে করা হল যে এসব ব্যাপারের পেছনে রয়েছে সি.পি.আই.(এম)। কারণ সি.পি.আই.(এম) মন্ত্রীসভার একটি বড় শরিক দল। ১৮ মার্চ আজামাবাদ বাগানের সীমানায় অনুষ্ঠিত শিলিগুড়ি মহকুমা কৃষক সমিতির সম্মেলনে 'সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে' জমি দখলের প্রস্তাব পাশ হয়।

> ''কানু সান্যালের মতে, ১৮ই মার্চের উক্ত কৃষক সম্মেলন ঘোষণা করলো : (১) গ্রামের সমস্ত ব্যাপারে কৃষক সমিতির বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত কর। (২) জোতদার ও গ্রাম্য প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য সংগঠিত হও ও সশস্ত্র হও। (৩) জোতদারদের জমির একচেটিয়া মালিকানা ভেঙে ফেলে কৃষক কমিটি মারফৎ নতুন বাঁটোয়ারা শুরু কর। সম্মেলন আরও ঘোষণা করলো, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম, সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির, কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার থেকে রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারের দমনের মুখে পড়বে। তাই সমস্ত দমনকে সশস্ত্রভাবে প্রতিরোধ করতে হবে দীর্ঘকালীন সংগ্রাম চালিয়ে। এই সম্মেলনের আওয়াজ মুহূর্তে বিপ্লবী কৃষক জনতার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করলো... কানু সান্যাল বলেন যে বিপ্লবী কৃষকেরা সম্মেলনের এই আওয়াজকে কার্যকরী করতে গিয়ে প্রথম জোর দিল গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সশস্ত্র দল গড়ে তোলার উপর। প্রতিটি গ্রামে শোনা গেল 'বন্দুকের নলই রাজসত্তার জন্ম দেয়'। তার কারণ সুদ বন্ধের আন্দোলন থেকে প্রতিটি ছোট খাটো লড়াই লাঠি ও বন্দুকের সম্মুখীন হয়েছে। তাই এই আওয়াজ সমস্ত কৃষকদের সংগঠিত করে তুলতে যাদুর মতো কাজ করেছে।'' [৭]

নির্বাচনের পরে অপ্রত্যাশিতভাবে যখন সি.পি.আই.(এম) সরকারি ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গদি রক্ষার কারণে নরমপন্থী কথাবার্তা বলতে বাধ্য হয়, কিন্তু দলের বিপ্লবপন্থী কর্মীদের মনোভাব এর ফলে আরও জঙ্গি ভাব ধারণ করে। এই সময় সি.পি.আই.(এম) পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক হরেকৃষ্ণ কোঙার, তিন অঞ্চলের কৃষক সংগ্রামের আর একজন সংগঠক মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য প্রাদেশিক নেতা কর্মীরা শিলিগুড়িতে গিয়ে জঙ্গি আক্রমণে উৎসাহ জোগাতেন। মহকুমা কৃষক সমিতির নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন জঙ্গল সাঁওতাল, তিনি আবার সি.পি.আই.(এম)-এর শিলিগুড়ি লোকাল কমিটির সদস্য। জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের একজন প্রধান সংগঠক ও যোদ্ধা

তিনি। মার্চের প্রথম দিকে যখন নকশালবাড়ি অঞ্চলে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলন ঘটতে থাকল কৃষক সভার সদস্যদের জঙ্গি মেজাজ তখন ছিল তুঙ্গে। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত আন্দোলনগুলো কৃষি সংক্রান্ত দাবিকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে—'৯ই মার্চ থেকে ২২শে মে পর্যন্ত সময়ে পুলিশের কাছে এরকম ১০০টি সংঘর্ষের ঘটনার রিপোর্ট আসে।'

> ''প্রথম সংঘর্ষ শুরু হয় যখন বিপুল কিষাণ নামে এক কৃষককে জোতদারদের দালাল-গুণ্ডারা হঠাৎ অতর্কিতে আক্রমণ করে মারধর করে। এই ঘটনা বারুদের স্তুপে আগুন ধরায়। তিনটে থানা জুড়ে কৃষকেরা জমি, ফসল এবং জোতদারদের জমানো খাদ্যশস্য দখল করার উৎসবে মেতে ওঠেন। দুচার জায়গায় জোতদাররা প্রতিরোধের চেষ্টা করলে কৃষকদের সশস্ত্র ইউনিটের হাতে চূর্ণ হয়। কয়েকটা জায়গায় ওদের কেউ কেউ খতম হয়। জোতদার-মহাজনরা এলাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করে।'' [৮]

—এরপর পুলিশমন্ত্রী জ্যোতি বসু পুলিশবাহিনীকে মার্চ করার নির্দেশ পাঠান। পুরোদমে চলতে থাকে জমিদখল, বন্দুক দখল, জোতদার বাড়িতে হামলার ঘটনা আর তার সঙ্গে সমান তালে চলে পুলিশের ধরপাকড়। এরপর ২৪শে ও ২৫ মে কিছু চরম ঘটনার জন্ম হল যা নকশালবাড়ি আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব সূচনা করে দিল।

> ''সেই ক্রান্তিকালের একজন নায়ক রথখোলার ভীমরাম জোতের আদিবাসী কৃষক বিগল কিষাণের কথায় 'সমিতি ডাক দিল সব জমি দখলের, ধান দখলের। আমি চাষ করতাম স্থানীয় জোতদার ও বাংলা কংগ্রেসের নেতা ঈশ্বর তিরকির জমিতে। সমিতির ডাকে লাঙ্গল নিয়ে গিয়েছিলাম জমির দখল নিতে। কিন্তু লহরী বুড়ার জমির উপরেই ঈশ্বর তিরকির লোকজন আমায় মারতে লাগল। ওরা আমার মাথা ফাটিয়ে দিল। লাঙ্গল, বলদ সব কেড়ে নিল এর প্রতিবাদে প্রহ্লাদ সিং ওর বৌ সোনামতি সিং ও মুজিবরের সাথে কৃষক সমিতির লোকজন মিলে ঘেরাও করে ঈশ্বর তিরকির ঘর।'' [৯]

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৪ মে এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ইনস্‌পেক্টর সোনম ওয়াংদিকে সাথে নিয়ে নকশালবাড়ি থানার অফিসার এস. মুখার্জী, এস. আই. নারায়ণ চৌধুরী ও বি. ভট্টাচার্য সহ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী এলাকায় (হাতিঘিষার বড়ঝাড়ু জোতে) ঢোকে এবং হামলা চালায়। কয়েক হাজার মানুষের ঘেরাও এর মুখে পড়ে। বুড়াগঞ্জ আজামাবাদ শিবদাল্লাজোত ও বিজয়নগর চা বাগান থেকে হাজার হাজার মানুষ পুলিশকে ঘেরাও করে। এক কৃষকের তীর বেঁধে সোনম ওয়াংদির বুকে, তীরের আঘাতে অন্য অফিসাররাও আহত হন। তখনকার মতো পুলিশ পিছু হটে, পরের দিন সোনম ওয়াংদি মারা যান। সমস্ত অঞ্চলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী টহল দিতে শুরু করে।

এই ঘটনার পর প্রহ্লাদ সিং ও তার স্ত্রী সোনামতির উদ্দোগে একটা মহিলা সভার আয়োজন করা হয়। নকশালবাড়ি বাজারের উত্তরপশ্চিম প্রসাদজোতে—

> ''২৫ তারিখে সভা যখন চলছে তখন হঠাৎ আসাম ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ এর একটা টহলদারি ভ্যান সভার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, একটু দূরে গিয়েই ভ্যানটি দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সশস্ত্র পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে পাশের ঝোপঝাড়ে 'পজিশন' নিয়ে সভার দিকে তাক করে হঠাৎ গুলি চালাতে লাগল, তৎক্ষণাৎ সেখানে সাতজন মহিলা ও দুজন শিশু সহ এগারোজন কৃষক শহীদ হয়ে গেলেন। সোনামতি সিং-এর বুকের গুলি বিদ্ধ করল তার পিঠে বাঁধা ছোট আট মাসের শিশুটিকেও বেঙ্গাইজোতের মাটি লাল হল শহীদের রক্তে আর সেদিন থেকেই ইতিহাসের পাতায় রক্তের লাল অক্ষরে লেখা হল একটি নাম—নকশাল বাড়ি।'' [১০]

নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রতিবাদে ঝড় উঠেছিল সমগ্র দেশ জুড়েই। ২৫ মে বেঙ্গাই জোতে শহীদ হলেন—ধনেশ্বরীদেবী, সামসরী শৈবানী, গাউদ্রাউ শৈবানী, সোনামতি সিং, ফুলমতি দেবী, সুরুবালা বর্মণ, সীমাশ্বরী মল্লিক, নয়নেশ্বরী মল্লিক, খর সিং মল্লিক ও দুজন শিশু। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদে শুরু হল মিছিল মিটিং, ধর্মঘট ও সম্মেলনের পর্ব। বামপন্থী বহু সংগঠন এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করল। শিলিগুড়ির রেল ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মচারীরা এর প্রতিবাদে বিশাল মিছিল বের করেন। চা বাগানের শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করলেন। একদিকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলন আর অপর দিকে চলতে থাকল পুলিশি অত্যাচার। ১০০ জন কৃষককে গ্রেফতার করা হয়। কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল সহ অন্যান্য কৃষক নেতাদের বিরুদ্ধে রজ্জু করা হল ৬০টি মামলা। ২৬ মে উত্তরবঙ্গের রিচমনড হিলে নকশালবাড়ির ঘটনাও পরিস্থিতি নিয়ে এক গোপন বৈঠক বসালেন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী। ওই বৈঠকে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করা হয়। আর ঠিক করা হয় সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে গঠন করা হবে 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন কমিটি'। এই কমিটির কাজ হল এলাকার ভূমি-সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করে সরকারকে জানানো। অন্যদিকে—

> ''সি. পি. এমের অবস্থা তখন 'কুল রাখি না শ্যাম রাখি'। এতদিন পার্টির মিলিট্যান্ট ও রাজনৈতিক অংশকে সাথে রাখার জন্য সি. পি. এম. বিপ্লবের কথা বলেছে, জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলেছে। এমন কি গণ আন্দোলনে পুলিশ পাঠানো হবে না, একথাও বলেছে। তা সত্ত্বেও নকশাল বাড়িতে কৃষক হত্যা হল সেই ফ্রন্টের আমলেই। অতএব এখন কোন পথ নেবেন তারা? ৩০ মে সি. পি. আই (এম) রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত সাংবাদিকদের জানালেন, গত ২৭ মে দলের পলিটব্যুরো সদস্য বি. টি. রণদিভে ও পি. সুন্দরাইয়া সহ রাজ্যের তিন মন্ত্রী ও সেক্রেটারীয়েটের নয়জন সদস্যের উপস্থিতিতে নকশালবাড়ির ঘটনার

> পরিপ্রেক্ষিতে যে জরুরি মিটিং হয় তাতে নকশাল বাড়ির কৃষকদের উপর পুলিশের গুলি চালনার নিন্দা করা হয়েছে এবং ঘটনায় পুলিশকে দায়ী করা হয়েছে।" [১১]

সি. পি. এম. পার্টির তরফে প্রথমে এই সংগ্রামকে সমর্থন করলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই সংগ্রামকে হঠকারী বলে তাদের মুখপত্রে বিরোধিতা করা হয়। কলকাতায় ছাত্র যুব সম্প্রদায় নকশালবাড়ির লড়াইকে সমর্থন করে মিছিল ও পোস্টার দিতে শুরু করে। তৈরি হয় নকশাল বাড়ি সংগ্রাম সহায়ক কমিটি'। সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত প্রমুখ পার্টির বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই পার্টি ছেড়ে নকশালবাড়ি সংগ্রামের সমর্থনে প্রচার করতে শুরু করেন। 'নকশালবাড়ি সংগ্রাম সহায়ক কমিটির ২৭শে জুন কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরী হলে সভাপতি নির্বাচিত হলেন প্রমোদ সেনগুপ্ত। সহসভাপতি সুশীতল রায় চৌধুরী ও সত্যানন্দ ভট্টাচার্য এবং সম্পাদক পরিমল দাশগুপ্ত। নকশাল বাড়ির ঢেউয়ে উত্তাল হল কলকাতা। এদিকে গোটা জুন-জুলাই মাস ধরেই নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি দাপিয়ে বেড়াতে লাগল কৃষক গেড়িলাবাহিনী। '৯ জুন খড়িবাড়ি থানায় খয়রাজোত গ্রামে এক ধনীর বাড়িতে হাজার দুয়েক মানুষ তীর ধনুক নিয়ে আক্রমণ করে।' এরপর বন্দুক লুঠ করতে থাকে গেরিলাবাহিনি।

> ''১৯শে জুলাই এক বিশাল সামরিক-আধা সামরিক বাহিনি এলাকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চা-বাগানের শ্রমিকেরা কৃষকদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। ১৯ তারিখে চলে নির্বিচারে হত্যা। শোভান আলি, বরকামাঝি, তিলক মাঝি শহিদ হন। চারু মজুমদার লিখলেন 'ভারতের গ্রামে গ্রামে নকশাল বাড়ির জন্ম হচ্ছে। নকশালবাড়ি মরেনি, মরতে পারে না ... কখনই মরবে না ... ভলগার রুদ্ধ স্রোতে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা হচ্ছে।" [১২]

এর কিছুদিন পর ২৮শে জুন। পিকিং রেডিও ঘোষণা করে—'ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার গ্রামাঞ্চলে, কৃষক জনতার সশস্ত্র সংগ্রামের অধ্যায় শুরু হয়ে গেছে। ...ভারতীয় বিপ্লবীদের শুরু করা সশস্ত্র সংগ্রামের এটি হল সম্মুখ পদক্ষেপ।' এর কিছুদিন পরে ৫ই জুলাই চিনাপার্টির মুখপত্র 'রেনমিন রিবাও' (Peoples Daily)-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'Spring thunder over India' বা 'ভারতের বুকে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থনে রচিত। এই প্রবন্ধে আক্রমণ করা হয়েছে অকংগ্রেসি মন্ত্রীসভা ও তার রাজনৈতিক দলগুলো 'সমস্ত ভারতীয় বিদ্রোহী সি. পি. আই. (এম.) সদস্যদের জোট বাঁধার ক্ষেত্রে মতাদর্শের প্রেরণা দানকারী শক্তি ছিল এই সম্পাদকীয় নিবন্ধ'। এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী অংশের নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার জন্য লাল এলাকা গড়ে তুলেছেন।' চীনা জনগণ পৃথিবীর সমস্ত মার্কসবাদী লেনিনবাদী-র মতো দার্জিলিং জেলার কৃষকদের এই

বিপ্লবী-তুফানকে অভিনন্দন জানায়। এই সময় সি. পি. এম.-এর মুখপত্র দেশহিতৈষী কেন্দ্রিক বিপ্লবী কর্মীদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। তখন বিভিন্ন প্রদেশের বহিষ্কৃত বিপ্লবী সদস্যদের একত্রিত করে ১৩ নভেম্বর কলকাতায় একটি কনভেনশন আয়োজিত হল। আয়োজক 'নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি'। এখান থেকেই গড়ে উঠল সি. পি. এম. এর মধ্যকার নিখিল ভারত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি বা A. I. C. C. R. of C.P.I. (M)। এই কমিটি তিনটি প্রস্তাব ঘোষণা করে পার্টি থেকে তাদের আলাদা অবস্থান স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দিল। প্রথমত জানানো হল যে— C. P. I. (M) জনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নকশাল আন্দোলন আমাদের দেশের পার্টির ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে হবে। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির যৌথ নেতৃত্বেই তা সম্ভব। দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গ্রাম দিয়ে শহরগুলিকে ঘিরে ফেলতে হবে দখল করতে হবে। চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে হবে। তৃতীয়ত নির্বাচন বয়কট করতে হবে, গণআন্দোলন, গণসংগঠন তৈরি করতে হবে—

> ''ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তখন সশস্ত্র লড়াই এগিয়ে চলেছে। শ্রীকাকুলামে গেরিলা বাহিনি একের পর এক আক্রমণ করছে দালাল ও ভূস্বামীদের। মুশাহারীর গেরিলার দল খতম করেছে দুর্ধর্ষ জমিদার বিজনী সিংকে। গোপীবল্লভপুর, ডোবরা অঞ্চলে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয়েছে। চারু মজুমদার ১৯৬৮-র শারদীয়া দেশব্রতী সংখ্যায় লিখলেন বিপ্লবী পার্টি গড়ার কাজে হাত দিন। ১৯৬৯-এর ৮ই ফেব্রুয়ারি A.I.C.C.R. পার্টি গড়ার সময় হয়েছে বলে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ১৯ থেকে ২১ এপ্রিল লেনিনের জন্মদিনে জন্ম নিল ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী— লেনিনবাদী। ১লা মে ১৯৬৯ সালে মনুমেণ্ট ময়দানে (শহীদ মিনার) সে পার্টির প্রকাশ্য ঘোষণা করলেন কানু সান্যাল।" [১২]

চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন নকশালপন্থী সি. পি. আই (এম-এল) দলে তখন হাজার হাজার মধ্যবিত্ত যুব ছাত্র যোগ দিয়েছে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছুঁড়ে ফেলে এই সব মেধাবী ছাত্ররা পড়াশোনা ছেড়ে গ্রামে চলে যান কৃষকদের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য। চারু মজুমদার ডাক দিলেন—'সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন।' আর এই নকশালপন্থী ছাত্ররা 'নিজেকে বদলাও দুনিয়াটা বদলাও' শ্লোগান দিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন আন্দোলনের মূল শক্তিই হয়ে উঠল এই সব মধ্যবিত্ত যুব ছাত্র। ঊনসত্তর সালের এপ্রিলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে লিন পিয়াও বললেন 'এটা মাও সে তুঙের যুগ'—এ যুগে লেনিনীয় ধ্যান-ধারণা ঠিক নয়। ছাত্রদের বক্তব্য 'যে আমলাতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় কর্মসংস্থান হয় না তার বিরুদ্ধেই তাঁদের প্রতিবাদ। তাদের শ্লোগান—'ডিগ্রি চাই না চাকরি চাই, খেয়ে পরে বাঁচতে চাই।' আহ্বান জানায়

‘পিকিং রেডিও শুনুন’ অন্যদিকে তৈরি হল নকশালপন্থী কিন্তু চারু মজুমদার বিরোধী বিপ্লবী গণসংগ্রাম কমিটি। চারু মজুমদারের নির্দেশে তখন চলছে স্কুল কলেজে অ্যাকশন, লাল পতাকা উত্তোলন, মূর্তি ভাঙা, স্কুল কলেজ পোড়ানো। শহরে তখন C. P. I. (M-L) এর আন্দোলন পুলিশ, মিলিটারি, আমলা খতম আর গ্রামে জোতদার খতমের লাল সন্ত্রাস। আগস্ট আন্দোলন পরিণত হয় নকশালপন্থী আর পুলিশের খুনোখুনিতে।

নকশালপন্থীরা সত্তর সালের মার্চে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, নেতাজী সুভাষ বসু, বিবেকানন্দ সবার মূর্তি ভেঙে দিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ মুখার্জীর মূর্তি ভেঙে ফেলে। মূর্তি ভাঙা ও স্কুল কলেজ অ্যাকশন নিয়ে চারু মজুমদার ও সুশীতল রায়চৌধুরীর মধ্যে বিরোধ চলে। ১৯৭০-এ ১৪ জুলাই চারু মজুমদার লেখেন ‘ছ-মাসের মধ্যে শ্রীকাকুলামের লড়াই ভিয়েতনামের লড়াইয়ের পর্যায়ে উঠে যাবে’ আন্দোলনকারীদের উৎসাহিত করে। ১-ডিসেম্বর তিনি লিখেছিলেন দেশব্রতীতে—‘মাগুর জানের রাইফেল সংগ্রহের মধ্য দিয়ে গণমুক্তি ফৌজের জন্ম হল, বাংলাদেশে যেখানে যত দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের স্কোয়াড আছে আজ সে গুলো পার্টির নেতৃত্বে গণফৌজের অংশ। তাই আজ আমরা ঘোষণা করছি যে বাংলাদেশে গণমুক্তি ফৌজ গড়ে উঠেছে। প্রতিটি এলাকায় এলাকাভিত্তিক ও রিজিয়ান ভিত্তিক একজন করে কমাণ্ডার নির্বাচিত করতে হবে।’ নকশালপন্থীরা একাত্তরের মাঝামাঝি পর্যন্ত মহাজন, চালকল মালিক, পুলিসের ইনফর্মার খুন করে, তেমনি পুলিশ ও অন্যান্যদের থেকে রাইফেল ছিনতাইও করে। বীরভূমে প্রায় ১৫৭টি খুন ও ২৫৫টি রাইফেল ছিনতাই এর ঘটনা ঘটে। আর অন্য দিকে আইনের রক্ষক পুলিশবাহিনী হাজার হাজার নিরস্ত্র অসহায় নকশালপন্থীদের গ্রেফতার করে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে খুন করে। শয়ে শয়ে কর্মী জেলে বন্দী হয়। ঘটে যায় কয়েকটি গণহত্যা মামলা, জেলেও বন্দীরা পার্টি সেল করে থাকেন। জেলের পার্টিকর্মীদের শ্লোগান ছিল—‘ভারতের গণমুক্তি ফৌজ লাল সেলাম’, ‘পুলিশ তুমি একটু ভাবো কার স্বার্থে রাইফেল ধরো—তোমার মাইনে একশো বারো’, ‘সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করবই করব।’ তাদের ভাবনা ছিল—‘আমরা জেলের তালা ভাঙবই ভাঙব। বুর্জোয়াদের কারাগারকে আমরা শ্রেণিসংগ্রামের ক্ষেত্র বানিয়েছি। জেলের উঁচু পাঁচিল টপকে আমরা গণমুক্তি ফৌজে যোগ দেব।’ ‘শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবেই হবে, সেদিন আর বেশি দূর নয় যেদিন টাটা বিড়লার মতো বুর্জোয়াদের পিঠের চামড়ায় জুতো তৈরি করে গরিবেরা পায়ে দেবে।’ এরকম কিছু আবেগের স্রোতে ভেসেছিল নকশালপন্থীরা।

১৯৭১-এ ২০ মে চারু মজুমদার লিখলেন ‘পার্টি কংগ্রেসের পর এক বছর’ এই লেখায় চারু মজুমদার বললেন,

> ‘‘ছাত্র যুবরা আত্মত্যাগের জলন্ত উদাহরণ স্থাপন করেছেন। সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের স্কোয়াড মাগুর জানে রাইফেল

সংগ্রহের মধ্য দিয়ে গণমুক্তি ফৌজ গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। গেরিলা বাহিনিকে সশস্ত্র করার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে বন্দুক সংগ্রহ অভিযান চলছে।" [১৩]

নকশাল আন্দোলন যতই তীব্র হতে থাকে ততই বাড়তে থাকে প্রশাসনিক আক্রমণ। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি থেকেই আন্দোলনের উপর ধাক্কা আসতে থাকে। উত্থান পতনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে যখন এই আন্দোলন সত্তর দশকে পৌঁছায় তখন এর অবনতি ও অধঃপতনের সূত্রও গ্রথিত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে শ্রীকাকুলাম ও ডোবরা গোপীবল্লভপুরে পুলিশের গুলিতে ঘেরাও ও দমন অভিযানে অপরিণত ঘাঁটিগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। সাধারণ পুলিশ কর্মচারীরা যারা উৎপীড়নকারী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিনিধি তারা গ্রামের কৃষক ও পিছিয়ে পড়া তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিদের উপর চরম অত্যাচার চালায়, খুন, ধর্ষণ চলতে থাকে অবাধে। পুলিশি নিপীড়ন ও অপমানের শিকার হয় গ্রাম ও শহরের গরিব জনসাধারণ। বলা যায় সত্তর দশকের ওই প্রথম দু'বছরে শাসক গোষ্ঠীর নিপীড়নকারী চরিত্রের যেরূপ ফুটে উঠেছে তার নজির স্বাধীন ভারতবর্ষের অতীত তিন দশকের ইতিহাসে কখনো পাওয়া যায়নি। তবে ১৯৭২ সালে গ্রেফতার ও মৃত্যুর কিছু পূর্বে চারুবাবু স্বীকার করতে বাধ্য হন—'শ্রেণিসংগ্রামের মূল প্রশ্ন ক্ষমতা দখল-খতম নয়।' তবে একথা ঠিক—

"১৯৬৭-এ নকশালবাড়িতে যে আন্দোলনের সূত্রপাত তার অনেকগুলি মৌলিক অবদান ছিল। গ্রামীণ কৃষকেরা ঐতিহ্যবাহী সমাজতন্ত্র বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চরিত্রকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে বর্তমান ভারতে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে প্রধান ভূমিকায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করা এর সর্বপ্রধান দিক।" [১৪]

সময় ও সাহিত্য : উপন্যাস থেকে...

সত্তর দশক—আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক স্থিতাবস্থাকে একটা প্রচণ্ড আঘাতে উত্তাল করে তুলেছিল। সামাজিক চিন্তাভাবনার স্তর ভেঙে সত্তরের আন্দোলনগুলির প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রেও সত্তর দশক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯৭০-৭১-এর হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সাহিত্যিককে নানা প্রতিক্রিয়ায় আঘাত করেছিল। এঁরা কেউ এই আন্দোলনগুলির তাত্ত্বিক দিকের বিষয়ে অবহিত হয়ে এই সময়কে বেছে নিলেন আবার কেউ দেখলেন মানবিক সমস্যা। তবে একথা সত্য আন্দোলনগুলি প্রায় সব সচেতন লেখককেই কোনও না কোনওভাবে ভাবিত করেছিল। অবশ্য ভাবিত না করেও উপায় ছিল না, কারণ সমকালে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এগুলির চেয়ে প্রভাব সৃষ্টিকারী আন্দোলন আর ঘটেনি। সত্তর দশকের আন্দোলনগুলির তাত্ত্বিক ভাবনা শিল্পী সাহিত্যিকদের জনগণের সঙ্গে একাত্ম করেছিল। রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক বাস্তবজাত

এই আন্দোলনগুলিকে কেন্দ্র করেই এই সময়ের লেখকরা যেন আত্ম-অবলোপের মধ্য দিয়ে আপন আপন কলম শানিত করে নিয়েছিলেন। আমরা জানি রাজনৈতিক ডামাডোলের সময় লেখকদের, বুদ্ধিজীবীদের সতর্ক, অতন্দ্র ও সংগ্রামী হবার প্রয়োজন আছে। মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন—

> ''সত্তর দশককে আমি এইভাবে ভাবতে পারি, সেই অসামান্য সময় লেখকদের কি দিয়েছিল, আমরা তার কাছে কি নিলাম, তাকে কি দিলাম এবং কোথায় আমাদের ব্যর্থতা? প্রশ্নটি শুধু লেখালেখির নয়, সমগ্র সত্তার বলেই আমি মনে করি। কোন লেখক কি লিখেছেন, কখনোই সেখানে সত্তর দশকের ব্যাপার ফুরোয় না। ... বলা হয় আমি ঘোর রাজনৈতিক লেখক। কিন্তু আমি মনে করি লেখক হিসেবে আমি সময়টির প্রাপ্য দলিলীকরণে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি মাত্র।
>
> সত্তরের আন্দোলন আমাদের যা দিয়েছে তা সমগ্র দেশকেই দিয়েছে। লেখক দেশের সমাজের এক অংশ মাত্র। আমি লেখক তাই লেখার কথায় ফিরে আসব, কিন্তু দেশের ও মানুষের কথা না বলে উপায় নেই, আমি এই দেশেরই মানুষ, এবং দেশের শুভাশুভে আমার অস্তিত্বও জড়িত। সেই জন্য আর কিছু করতে পারি না বলে আমি লেখক, আমি তো খাদানে কয়লা কাটব না, ক্ষেতমজুর হব না, ভূমিদাস হব না, জঙ্গল নিয়ে লড়ব না, কৃষিক্ষেত্রে নেমে, সংগ্রাম করব না। তাই নিজের অস্তিত্বের সমর্থন খুঁজতে আমি লিখি।'' [১৫]

সময়ের দায় তাঁরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেননি। মহাশ্বেতা দেবী মনে করেছিলেন পেশাদার তথা মানবদরদী লেখক হিসাবে সত্তর দশক নিয়ে লেখা তাঁর কর্তব্য। আসলে সত্তরের আন্দোলনগুলি আমাদের সাহিত্যিকদের যেভাবে জনগণের সঙ্গে একাত্ম করেছিল, তা এর পূর্বে হয়নি। মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন 'সত্তরের দশক আমাদের শিখিয়েছে শোষণের নক্‌শাকে হাজারবার উদ্ঘাটন করে সাহিত্যের পাতায় তুলে আনতে'। মহাশ্বেতা দেবীর মতো সত্তর দশকের বিদ্রোহজাত বিপ্লব-আন্দোলন উদ্ভূত স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে সরব হলেন আরও অনেকেই।

মহাকালের রথের ঘোড়া : স্বপ্নভঙ্গের বেদনা

বাংলা উপন্যাস ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবীর মতো সমরেশ বসুও (১৯২৪-১৯৮৮) সত্তরের দশককে প্রেক্ষাপট হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। যদিও সার্থক পেশাদার লেখকের মতো সমরেশ বসু নানা রঙের নানা রসের উপন্যাস লিখেছেন। সত্তর দশকের আন্দোলনগুলির মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগানো ঘটনা ১৯৭১ সালের জুলাই মাস নাগাদ খড়িবাড়ি-ফাঁসিদেওয়া-নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন। সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসটি নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে এই অগ্নিগর্ভ সময়ের ছবি, নকশাল আন্দোলনের

যোদ্ধাদের এক মর্মন্তুদ চিত্র। উপন্যাসটি ১৯৬৭ সালে শারদীয়া দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৭ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। লেখক বলেছেন তিনি ইতিহাস বা ভূগোল লেখেননি। কাহিনি লেখকের কল্পনাজাত।

> ''ইতিহাস লিখতে বসিনি। ভূগোলও না। অতএব, উক্ত দুই বিচারে ত্রুটিমুক্ত নই। চরিত্র ও ঘটনার কি কোনো বাস্তব সম্পর্ক আছে? নেই। কল্পনায়? আছে। লেখকের কল্পনা যেখান থেকে উদ্ভাবিত হয়, এ কাহিনি সেখান থেকে গৃহীত, পরিণতিও তেমনই সৃষ্টিছাড়া, আর একান্ত আপন।'' [১৬]

উপন্যাস পড়লে বোঝা যায় ঐতিহাসিক ঘটনা, রাজনৈতিক চরিত্রের বাস্তবতা সম্পর্কে লেখক যত্নবান নন। কাহিনিবৃত্তে বিবৃত হয়েছে অগ্নিগর্ভ নকশাল আন্দোলনের সময় ও চরিত্র। তবে উপন্যাসে ডিটেলিং নয়, বরং সূত্র ও সংকেত ধরিয়ে দিয়েছেন লেখক।

আগেই বলা হয়েছে ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকেই ভারতবর্ষে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিভিন্ন প্রান্তে। তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক নিজেদের ভাগ বুঝে নিতে চেয়েছিল। শ্রেণিগত ঘৃণার প্রকাশভঙ্গির তীব্রতায় এই আন্দোলন শ্রেণিসংগ্রামের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। আর নকশালবাড়ি আন্দোলন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল যে—

> ''স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষ বিশ বছরেও (১৯৪৭-৬৭) স্বপ্নের আদর্শের ভারতবর্ষ হয়ে উঠতে পারেনি, যেতে পারেনি তার কাছাকাছি। গরিব আরও গরীব হয়েছে, ধনী আরও ধনী; ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বজ্রমুষ্টির চাপে নিষ্পেষিত হয়েছে কোটি কোটি মানুষ, গ্রামাঞ্চলে মুষ্টিমেয় ধনী চাষী সব চাষযোগ্য জমির মালিক হয়েছে, আর শিল্প বাণিজ্যের মালিক হয়েছে পঁচাত্তরটি বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।'' [১৭]

১৯৬৭ সালে উত্তর বাংলার তরাই অঞ্চলের অরণ্য প্রান্তর নকশালবাড়িতে যে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার পেছনে ছিল এই বঞ্চনার ইতিহাস। আসলে কৃষক আন্দোলন নকশালবাড়ি আন্দোলনে পরিণত হয়ে শ্রেণিসংগ্রামের পরিচায়ক হয়ে গিয়েছিল।

> ''১৯৫৮-৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ কৃষকসভা জোতদারদের হাতে থাকা 'বেনামি' জমি দখলের যে আহ্বান রাখে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা কৃষক সমিতির একটি সম্মেলন কৃষকদের বলে যে তারা যেন জোতদারদের ক্ষেত থেকে ফসল কেটে নিজ নিজ খামারে জড়ো করে। জোতদারদের বলে যে, জোতদাররা তাদের জমির মালিকানার প্রমাণ নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে দেখা করলে তবেই তাদের ভাগের ফসল পাবে। সমিতি কৃষকদের কাছে আহ্বান রেখে বলে জোতদার এবং পুলিশের হাত থেকে এই ফসল রক্ষা করার জন্য তারা যেন নিজেদের সশস্ত্র করে। এই আন্দোলন খুবই জঙ্গি রাস্তা নেয়,

জোতদারদের গুণ্ডা বাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে কৃষকদের অনেকগুলো সংঘর্ষ হয়, অস্ত্র ছিনতাই-ও হয়। ২০০০ কৃষক গ্রেপ্তার বরণ করেন, অনেকের বিরুদ্ধে অন্যরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার নির্দেশে শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

১৯৬৭ সালের আগের সমস্ত সংগ্রামগুলো যদিও ছিল মূলত অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া আদায় করার সংগ্রাম, সেগুলির একটি নিজস্ব বিশিষ্ট চরিত্রও ছিল। যেহেতু চা-বাগানের শ্রমিক এবং কৃষকরা একেবারে নিকট প্রতিবেশী ছিলেন, শ্রমিক-কৃষক-এর মধ্যে একটা গভীর ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছিল। এবং যখন এই সমস্ত আংশিক সংগ্রামে তাঁরা লিপ্ত ছিলেন, তখনও প্রয়োজন বোধ করলে তাঁরা তাদের সাবেকি হাতিয়ার, তীর-ধনুক তুলে নিতে দ্বিধা করেন নি।" [১৮]

উত্তর বাংলার তরাই-র নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও কেবলমাত্র নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকেনি। ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে এই আন্দোলনকে সফল করতে গ্রামীন কৃষক সম্প্রদায়কে পুরোভাগে রেখে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার কর্মসূচি গৃহীত হয়। ক্রমশ এই আন্দোলন কৃষক শ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সীমিত সংখ্যক শহুরে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক হয়ে যায়। ফলে খুব সহজেই এই আন্দোলনকে দমন করা যায়। ১৯৭২-র জুলাই মাসে আন্দোলনের প্রধান নেতা চারু মজুমদার বন্দী অবস্থায় মারা গেলে এই গণ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে সমগ্র সত্তর দশক জুড়েই চলেছে জোতদার অর্থাৎ শ্রেণিশত্রু খতমের দাপট। নকশালবাড়ি আন্দোলন স্থায়ী হয়েছিল মাত্র কয়েক বছর। সীমিত সময় স্থায়ী হলেও এই আন্দোলন বাঙালি মধ্যবিত্তের নিশ্চিন্ত, শান্তিপূর্ণ, নিভৃত প্রাত্যহিক জীবনকে জোরালো আঘাত দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যকেও এই আন্দোলন বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ঔপন্যাসিকরা এর দ্বারা বিশেষভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন, এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁদের বিভিন্ন উপন্যাসে তার অনিবার্য ছাপ পড়েছে। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত কয়েকটি উপন্যাসের উল্লেখ করা যাক—

স্বর্ণমিত্র—গ্রামে চলো;

অসীম রায়—গৃহযুদ্ধ, অসংলগ্ন;

মহাশ্বেতা দেবী—হাজার চুরাশীর মা;

গুণময় মান্না—শালবনী;

জয়ন্ত জোয়ারদার—এভাবেই এগোয়;

শৈবাল মিত্র—অজ্ঞাতবাস, অগ্রবাহিনী, যৌবরাজ্য।

এই সব উপন্যাস থেকে 'মহাকালের রথের ঘোড়া' আলাদা হয়ে যায় কারণ এইসব উপন্যাস নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। কিন্তু সমরেশ বসুর মহাকালের রথের ঘোড়ার অভিনবত্ব হল সরাসরি নকশালবাড়ি অঞ্চলে আশৈশব বড় হয়ে ওঠা এমন একটি চরিত্র কাহিনির নায়ক যার নকশাল আন্দোলনজনিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে এই এলাকার সমসাময়িক ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। তবে এর একটা বড় কারণ বোধহয় লেখকের সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ। সমরেশ বসু ১৯৪৪-৪৫-এ সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন এবং পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। এরপর তিনি একইসঙ্গে রাজনীতিচর্চা, মার্কসবাদ চর্চা এবং সাহিত্যচর্চা করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিস্বার্থান্বেষী সুযোগসন্ধানী অনাদর্শ লেখককে বীতশ্রদ্ধ করে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯৪৯ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হলে তিনি গ্রেফতার হন। জেলে বসে তিনি তরঙ্গ উপন্যাসটি লেখেন। প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্যকে পূর্ণ করেছে। আর এরকমই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি গড়ে তুলেছেন নকশাল আন্দোলনের নেতা রুহিতন কুরমি-র স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি।

মহাকালের রথের ঘোড়া আসলে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোদ্ধা রুহিতন কুরমি-র আকাঙ্ক্ষা নৈরাশ্যের পূর্ণাঙ্গ দলিল। কাহিনির শুরুতেই দেখা যায় নকশাল আন্দোলনে গ্রেফতার 'তরাইয়ের ভয়ংকর দাঁতাল' রুহিতন কুরমিকে পুলিশ গোপনে এক জেল থেকে আর এক জেলে নিয়ে যাচ্ছে। তার স্মৃতিচারণার সূত্রেই উপন্যাসে এসেছে তার অতীত বিদ্রোহের কাহিনি, যা আজ ইতিহাস। উপন্যাসের পশ্চাদভূমির প্রান্তিক সীমা দার্জিলিং জেলার নকশাল বাড়ি অঞ্চল।

> ''দার্জিলিং জেলার ভারত-নেপাল সীমান্তের ধারে ছোট একটি অঞ্চল নাম তার নকশালবাড়ি। এখানকার লোকে বলে বন্দর। পাশ দিয়ে তার বয়ে চলেছে মেচি নদী। বর্ষাকালে এ নদীতে জোয়ার বইলেও, শীতকালে তার হাঁটুজলে হেঁটেই পারাপার করে এখানকার মানুষ। রাজবংশী, সাঁওতাল, ওঁরাও, নেপালী, মদেশিয়া আদিবাসীরাই এখানকার প্রধান বসবাসকারী। নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া মিলে প্রায় ৩০০ বর্গ মাইল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জোতদার মহাজন, দালাল আর চা বাগানের মালিকদের শোষণে ইংরেজ আমল থেকেই কেবল দুমুঠো অন্নের জন্য উদয়াস্ত খাটে এখানকার মানুষ।
>
> ১৮৫৯ সালের রেন্ট অ্যাক্টের (দশ) ধারায়, বারো বছর চাষ করা জমির দখলি স্বত্ব নেবার নির্দেশ থাকলেও। কোন জমিই আধিয়ার পেত না। এমনকি যে-সমস্ত কৃষক শস্য দিয়ে সরকারকে খাজনা দিতেন, তাদেরও প্রজা হিসাবে কোন স্বীকৃতি ছিল না... ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন এবং তেভাগা আন্দোলনের সময় থেকেই ধীরে ধীরে

জোট বাঁধতে থাকে এখানকার কৃষকেরা। কয়েক দশক পেরিয়ে ষাটের দশকের শেষভাগে একদিন ইতিহাসের পাতায় উঠে এল নকশালবাড়ির নাম।" [১৯]

'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসে তার বর্ণনা এরকম—

"সেই জায়গাটার নাম এখন দুনিয়া জানে। যেখান থেকে রুহিতনদের বাস ছিল, নীচের দক্ষিণপূর্বে, তরাইয়ের মেচি নদীর বালুচর থেকে, ঝোরার গা বেয়ে উঁচুতে উঠে যাওয়া বনঘেরা অঞ্চল। সেই জায়গাটার মতোই, দুনিয়া এখন রুহিতন কুরমির নামটাও জানে।" [৫]

রুহিতনের ঠাকুরদা ছিল তিন পুরুষের চা বাগানের মজুর। তার বাবা পোশ্‌পত (পশুপতি) কুরমিকে নিয়ে তারা চার পুরুষ নকশালবাড়ি পূর্বাঞ্চল চা বাগানের মজুর, রুহিতন হল পাঁচপুরুষ। ছেলেবেলায় সে-ও কিছুদিন চা বাগানের কাজ করেছিল, তার বাবা পোশ্‌পত কুরমিই প্রথম চা বাগানের কাজ ছেড়ে চাষ আবাদের কাজে লেগেছিল। রুহিতনও বাবার সঙ্গে চাষ-আবাদের কাজই করত। কারণ চাষ-আবাদ মানেই ঘর-গৃহস্থালি। তার বাবা পোশপত্ চা বাগানের জীবন চায়নি তাই কোরফা রায়ত হিসাবে জোগাড় করেছিল এক টুকরো জমি যা তার ভূমিহীন কৃষক নাম ঘোচাবার জন্য যথেষ্ট নয়। আসলে জোতদারদের জমি আবাদ করাই ছিল তাদের আসল কাজ। তবু চার পুরুষের সেই পরিবর্তনের মধ্যে, নিজেকে ফিরে পাবার একটা নতুনের স্বাদ আর উৎসাহ ছিল। ছিল স্থিতি আর স্থায়িত্বের একটা আশা। নেশা না, একটা তৃষ্ণা জমি-চাষ-আবাদ সম্পন্ন গৃহস্থালি। রুহিতনের রক্তেও সঞ্চারিত হয়েছিল তার পিতার এই তৃষ্ণা। তার ঠাকুরদার মনেও ছিল এ আকঙ্ক্ষা। এটা একজন কুরমির আদিম পিপাসা। চাষবাস, নিজের একটা ঘর, এক জোড়া বলদ, লাঙল আর কিছু চাষের জমি। কারণ জমি মানেই স্থিতি-স্থায়িত্ব। কিন্তু রুহিতনের পিতা একজন সাধারণ টিক্‌কাদারের অধিকারও জমিতে পায়নি। পেয়েছিল শুধু উঠ্‌বন্দি প্রজাস্বত্ব, যাদের বলে দার টিক্‌কাদার, অথবা কোরফা রায়ত। তারা বাস করে, চাষ করে, কিন্তু জমির ওপরে কখনওই কোনও অধিকার জন্মায় না। ওঠ্ বললেই ওঠো, যাও বললেই ভাগো। তবু জমি পেয়ে পোশ্‌পত্ আত্মহারা হয়ে যায়, খুশির ঝোঁকে সে কিছুকাল পচাই খেতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল।—

"কিন্তু যেখানে চৌধুরী, জোতদার মণ্ডল আর টিক্‌কাদাররা সমস্ত রকমের জমির ওপর দখল রাখে, সেখানে পোশপত্ কুরমির মতো একজন সামান্য মজুর কোন সাহসে জমির স্বপ্ন দেখেছিল... চৌধুরীরা হল সব বাঙালি অফিসার, যারা জমির ভাগ বাটোয়ারা করে, খাজনা আদায় করে, আর সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সকলের বিচার ও শাসন করে। এক সময়ে 'চৌধুরী' নাম ছিল তারই অঞ্চলে পাগলা হাতির মতো হৃদকম্প।" [২১]

পোশপত, কুরমি এরকমই একজন চৌধুরীর নেকনজরে পড়েছিল।

"নকশালবাড়ির পুবের চা বাগান থেকে রাতারাতি চলে এসেছিল টুকরিয়াঝাড় জঙ্গলের দক্ষিণে, রেললাইনের পূব পারে। চা বাগানের পাঁচ-মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। রামধন মৌজার

নীচে, ময়নাগুড়ি মৌজার কিছু ওপরে, রেললাইন সরে গিয়েছে পশ্চিমে, নেমেছে দক্ষিণে গলগলিয়া দিয়ে ঢুকেছে পূর্ণিয়া জেলায়। উত্তরে তাকালে মিরিকের বন পাহাড় দেখা যায়। পূবে আধ মাইলের মধ্যে মেচি নদী, নেপালের সীমানা। ওপারে মোরাং কারিয়াঝাড়। আরও দক্ষিণে ভদ্রপুর।"

এরকম স্থানেও পোশ্‌পতদের মতো কোরফা রায়তরা নিশ্চিন্তে জীবন ধারণ করতে পারে না। পোশপত কুরমি চৌধুরী সাহেবের কৃপায় যে জমিখণ্ড পেয়েছিল তা ছিল জোতদার মোহন ছেত্রীর জোতের সীমানার মধ্যেই। সে জমিকে তরাই অঞ্চলের শুখা ক্ষেত বলা হয়। মেচি নদীর পলি তুলে এনে সেই বন্ধ্যা জমিকে ফসল ফলানোর উপযুক্ত করে নিতে হয়, তবে এত পরিশ্রমে তৈরি করা ভূমিখণ্ডের গাছপালার মালিক হয়ে যায় জোতদার। তবুও পোশপত্ কুরমির মতো ভূমিহীন আধিয়াররা দমে যায় না। পোশপত্ স্বপ্ন দেখে একদিন সে রায়তি স্বত্ব পাবে, টিক্‌কাদার হয়ে যাবে। তবে সে স্বপ্ন তার কোনোকালেই পূর্ণ হয়নি। রুহিতন বালককাল থেকেই বাবার স্বপ্নের অংশীদার ছিল—

"রুহিতন চা বাগানের বালক মজুর থেকে, চাষের কাজে লেগেছিল। মেচি নদী থেকে, বেতের ঝোড়ার বাঁকে, মন মন পলিমাটি ঘেঁটে নিয়ে আসত। ঝোরা আর আশপাশের সরু নালি স্রোতস্বিনীর জল ধরে রাখত, চারপাশে আল বেঁধে, পোশপত্ কুরমির ব্যাটা সে—বাবার তৃষ্ণাটা তার রক্তেও লেগেছিল।"

—এই জমির তৃষ্ণা, যখন তাদের আর মিটল না, স্বপ্ন যখন শুধু স্বপ্নই থেকে গেল তখনই রুহিতন জোতদারদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা কৃষক আন্দোলনের শরিক ও যোদ্ধা হয়ে উঠল। হয়ে উঠল, শ্রেণিশত্রু খতমের প্রধান নেতা। তার বাবা পোশ্‌পত কুরমি পর্যন্ত জীবনের একটা ধারা। রুহিতন কুরমির জীবনের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা।

ফাঁসিদেওয়ার বড় জোতদার দীনু বাগচির ছেলে দিবা বাগচির কাছেই রুহিতনের রাজনীতির প্রথম পাঠ—

"তার কয়েকবছর পরেই, দার্জিলিং হিমালয়ান রেল মজুরদের ধর্মঘট। গোটা পাহাড়ে তরাইয়ে এঞ্জিনের ধোঁয়া ওড়েনি। রেলের চাকা ঘোরেনি। মাঠে মেচির পলি ছড়াতে ছড়াতে, রুহিতনের রক্ত টগবগিয়ে উঠেছিল। কেন? কোম্পানির সাহেবরা, মারোয়াড়ি বিহারি মহাজনেরা, বাঙালি-রাজবংশি, নেপালি জোতদাররা ক্ষেপে উঠেছিল। গরিবদের চিরশত্রুদের পরাজয়ে বুকের রক্ত টগ্‌বগিয়ে উঠেছিল। নিজের এই চরিত্রটা তার অজানা ছিল। দিবাবাবুরা তখন বাগান আর শহরে আন্দোলন করছিল। চেনা শোনা হয়নি। রেল ধর্মঘট করেছিল অন্য একটা দল। সেই সার্থক ধর্মঘট এখনও তার মস্তিষ্কে বিঁধে আছে। বিঁধে আছে তারপরের অনেক লড়াইয়ের ঘটনা।" [২২]

জীবনের সমস্ত কিছুকে পণ করে রুহিতন লড়াইয়ে নেমেছিল। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার লড়াই। শ্রেণিশত্রু খতমের লড়াই, মুক্তাঞ্চল স্থাপনের লড়াই। আট বছরের জেল-জীবনে তার মন যেন মাঝে মাঝে দুর্বল হয়ে যায়। স্মৃতিচারণ করে রুহিতন, মনে পড়ে স্ত্রী মঙ্গলা, ছেলে মেয়ে আর মায়ের কথা। কিন্তু মনের এই দুর্বলতার সময় নেমে আসে এক যন্ত্রণাবিদ্ধ অনুতাপ 'এসব দুর্বলতা তার কেন থাকবে? জীবনের সব কিছু পণ রেখে যার লড়াই, তার কী কোন অতীত থাকে? অথবা স্মৃতি? এমন কোন অনিবার্যতাকে সে মেনে নিতে পারে না।' জেলজীবনে তাকে অকথ্য অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। নকশালবাড়ির সশস্ত্র বিদ্রোহের একজন প্রধান যোদ্ধা রুহিতন, 'তরাইয়ের ভয়ংকর দাঁতাল'। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল খুন জখম লুট আগুন লাগানো অরাজকতা সৃষ্টি করা। সর্বোপরি রাজদ্রোহিতা, বলপূর্বক রাষ্ট্র দখল।

দিবা বাগচির দেখানো পথেই রুহিতনরা হেঁটেছিল। দিবা বাগচিই একটা শোলোক নিয়ে এসেছিল—

> ''গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে হবে, শহরকে গ্রামের কবজায় ঘিরতে হবে। কলকাতায় জমায়েত না। দক্ষিণের যাবৎ শহর ঘিরতে ঘিরতে, কলকাতাকেও গ্রাম দিয়ে ঘিরতে হবে''

রুহিতন সেই থেকে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার লড়াইয়ে জানকবুল করেছিল। খতম আর ঘেরাও-এর লড়াইয়ে সে ছিল প্রধান যোদ্ধা। দিবা বাগচি ছিল শিলিগুড়ির ধনে মানে বড় মানুষ দীনু বাগচির ছেলে। দীনু বাগচি ছিল মোহন ছেত্রীর থেকেও বড় জোতদার, ফাঁসিদেওয়ায় দিনু বাগচীর বিরাট জোত। কিন্তু দিবা বাগচি ছিল ভূমিহীন কৃষকদের মতো। একেবারে উল্টো পথে হেঁটেছিল। বাবার অর্থ-সম্পত্তির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না।—লেখাপড়া করতে করতেই চা বাগান আর ক্ষেতে জোতে ঘুরে বেরিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার দু-বছরের মধ্যে পুলিশ তাকে ধরে জেলে পুরে দেয়। তিন বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সংসারী হয়। আবার কিছুকাল পর যোগ দিয়েছিল নকশাল আন্দোলনে। এহেন দিবা বাগচির নেতৃত্বে রুহিতন সংগ্রাম চালিয়েছিল। তরাইয়ের চা শ্রমিক আর ভূমিহীন কৃষকদের নেতৃত্ব করে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল রুহিতন। মাথার উপর ছিল দিবাকর বাগচি, ভবানী রায়, আরও অনেকে। কলকাতায় মনুমেন্টের নীচে তাদের সভা, প্রবল উত্তেজনায় হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ মেতে উঠেছিল। স্ত্রী মঙ্গলা বলেছিল—'লড়াই করতে যাচ্ছ?' রুহিতন বলেছিল—'লড়াই মানে, কী আর, সারা দেশের কৃষি মজুর কলকাতার মাঠে জমা হয়ে সরকারের কানের তুলো খুলে দিয়ে আসব। ওরা যে কানে শুনতে পায় না। মস্ত ব্যাপার। গোটা দেশের কৃষি মজুর জমায়েত হবে, সকলের সাথে সকলের চেনা জানা হবে'। প্রবল উত্তেজনায় মেতেছিল ওরা।

> ''এক ধরনের বীরত্বপূর্ণ খুশিতে তার মন ভরে উঠেছিল। এ একটা বিরাট কিছু ঘটছে, সে বিষয়ে তার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। প্রমাণ ছিল সারাটা পথে পথে। পথের দুধারে মানুষের হাততোলা চিৎকার আর হাসির উল্লাসে।... কলকাতায় পৌঁছুনোটা আর এক উত্তেজনা। কলকাতায় ঢোকবার মুখেই, সেখানকার লোকজনও যেন পাগল হয়ে উঠেছিল। চা বাগানের মালিক বলো আর তরাইয়ের বড় বড় জোতের জোতদার বলো, সবাইকেই কী তুচ্ছ মনে হয়েছিল। যে কোনও শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া যায়। ...মনুমেন্টের নীচে সভাটা হয়েছিল প্রকাণ্ড। মানুষ মানুষ আর মানুষ। কিন্তু রুহিতন যে কী আশা নিয়ে গিয়েছিল, নিজেই তা জানত না। সভা শেষ হতেই তার মনটা কেমন হতাশায় ভরে উঠেছিল। সভায় অনেক অনেক বক্তৃতা হয়েছিল কী বেজায় হাততালি আর হইচই, তারপরেই যেন ঠিক ভাঙা মেলার হাল, ফিরে যাবার সময় কলকাতাকে আর মোটেই পাগল হতে দেখা যায়নি।'' [২৩]

সত্তরের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি ১৯৬৭ সালের ১১ই নভেম্বর কলকাতায় এক বিশাল সভা হয়েছিল। সেখানে দেড় দুলাখের বেশি মানুষ জমায়েত হয়েছিল। সে– সভায় নকশালবাড়ির পক্ষে নানা বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়েছিল। এই সভায় কমরেড চারু মজুমদার সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন—'আমি নকশালবাড়ির নেতা নই, নকশালবাড়ির নেতা কানু সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতাল'। ইতিহাস থেকে আর একটি ঘটনার প্রসঙ্গও প্রত্যক্ষভাবে এসেছে উপন্যাসে। রুহিতন তার বাবার কাছে ছেলেবেলায় শুনেছিল—

> ''বিপ্লবীরা বাংলার লাট বাহাদুর 'আনারসন'কে (স্যার জন অ্যান্ডারসন— গভর্নর জেনারেল) লেবং-এ হত্যার চেষ্টা করেছিল। রুহিতনের বয়স তখন ছিল আট বছর। দেশ ছিল পরাধীন।'' [২৪]

ইতিহাস বলে আন্ডারসনকে হত্যা করা হয় ১৯৩১ সালে। ইতিহাস না লিখলেও ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব লেখক অস্বীকার করতে পারেননি।

উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত পার্বত্য-জঙ্গলাক্ষেত্রে রুহিতন কুরমির পরিবারের মতো অসংখ্য পরিবার বহু প্রজন্ম ধরে জোতদার মহাজনদের দ্বারা শোষিত-শাসিত হয়ে এসেছিল। এদের জীবনধারণ ছিল খুবই নিম্নমানের। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন—কোনোরকম সুযোগ-সুবিধা থেকে ছিল বঞ্চিত। এই নিরবচ্ছিন্ন শোষণ থেকে ওরা মুক্ত হতে চেয়েছিল, মুক্তাঞ্চল গড়ার লড়াইয়ে নেমে ছিল রুহিতনরা। প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত দিক থেকে এমন পশ্চাৎপদ এলাকাগুলিতে আন্দোলনের সূচনালগ্নে এক অদ্ভুত প্রাণোন্মাদনা দেখা গিয়েছিল। ১৯৬৭-৬৮ তে এই সকল অরণ্যপ্রান্তর মুক্তাঞ্চল গড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনেও একটা পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছিল। সকল মানুষ কঠোর আর সচেতন হয়েছিল—

> ''রুহিতন ভুলতে পারে না, সেইসময় তরাইয়ের জঙ্গলে গ্রামে গ্রামে মানুষদের কী আশ্চর্য উৎসাহ আর সাহস। সে নিজে সব গ্রাম বা বিভিন্ন আস্তানায় ঘুরে ঘুরে দেখেছে। ছেলেবুড়ো, মেয়েমদ্দ, সকলের চোখমুখের চেহারা বদলিয়ে গিয়েছিল। সত্যি কি তারা একটা নতুন জীবন পেয়েছিল? ... মুক্ত অঞ্চল গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মধ্যেই একটা পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছিল। সকলেই কেমন সচেতন আর কঠোর হয়ে উঠেছিল। কঠোরতা এই কারণে, সকলেই নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করতে চেয়েছিল। মুক্ত এলাকাকে সবাই অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দিত।'' [২৫]

মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য ছিল জোতদার মহাজনরা। রুহিতনদের তখন একটাই ধর্ম 'মরো না হয় মারো' শত্রুর একটাই মাত্র বিচার, মৃত্যুদণ্ড। এই বিচারে রুহিতনের ছেলেবেলার বন্ধু বিরাট জোতদার মোহন ছেত্রীর ডাকসাইটে ছেলে বড়কা ছেত্রী তার হাত থেকে রক্ষা পায়নি। কারণ বড়কা ছিল তাদের অত্যাচারী 'শ্রেণিশত্রু'। এই বড়কা ছিল রুহিতনের শিকারের সঙ্গী, একসঙ্গে মেলায় যাওয়া, রং পাঁচালি মানপাঁচালি গান শোনা, জুয়া খেলা, সবের সঙ্গী। অথচ শ্রেণিশত্রু নিধনের যজ্ঞে রুহিতন সেই দুর্দান্ত দুর্মদ খুনিকে শুধু ঘুঁষি মারতে মারতেই রক্তাক্ত করে মেরে ফেলেছিল। এইভাবে তারা একটা শত্রুমুক্ত স্বাধীন অঞ্চল গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু জোতদার আর মহাজনরা গরীব আর ভূমিহীনদের স্পর্ধায় খুবই ক্ষেপে উঠেছিল। এত ক্ষেপে উঠেছিল, ওরা নিজেরাই লোক বেছে মারতে আরম্ভ করেছিল। মোহন ছেত্রী, রুকনুদ্দিন আহমদ, শনিলাল, এমনকী শুকু পোঙানিও একটা বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে বেড়াতে আরম্ভ করেছিল। ভূমিহীন কৃষকদের আক্রমণে জোতদাররা অনেকে আবার পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। বর্ডার পুলিশ আর সেনাবাহিনী রুহিতনদের আকস্মিক সশস্ত্র উত্থানের জন্য প্রস্তুত ছিল না। স্বভাবতই তারা প্রথম দিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল পরে পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিমে ঘিরে দক্ষিণের সমতলে শিলিগুড়ি, বিহারের সীমানা থেকে, প্রতি আক্রমণের প্রস্তুতিপর্ব দ্রুত শুরু করেছিল। হত্যা, জখম, লুট, ক্ষেত্রবিশেষে আগুন লাগানো, আর অস্ত্রাগার তৈরি, এ সমস্ত ঘটনা ঘটিয়েছিল বিদ্রোহীরা। কিন্তু এই এলাকার মানুষরা ছিল শুধু খুনি ডাকাত অপরাধী, নিজেদের সম্পর্কে একথা কোনওদিন শুনতে চাইবে না রুহিতনরা। রুহিতন দেখল উত্থানের সেই সময়টাকেই লোকে চিহ্নিত করেছে 'খুন খারাপি'র বছর বলেই। হঠাৎ পুলিশ আচমকা তাদের আস্তানা ঘিরে ফেলেছিল। এরপর তীর-ধনুক বন্দুক-গুলির লড়াই, পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল রুহিতন কুরমি, আর রুহিতনদের বহু অস্ত্র। রুহিতনের সন্দেহ ছিল দলের মধ্যে কি কেউ বিশ্বাসঘাতক আছে? রুহিতনদের এত সব অতি গোপন সংবাদ এরা পেল কেমন করে! এই বিশ্বাসঘাতক জোঁকগুলো বাইরের থেকে আমদানি করা দালাল, কর্তৃপক্ষের পোষা ইশারায় চলে, এরা অজানতেই ছোবল মারে।

শ্রেণিশত্রুর রক্ষাকর্তা পুলিশ রুহিতনকে বলপূর্বক বন্দী করে এনেছে, অমানুষিক অত্যাচার করেছে—'ধরা পড়ার পরে, প্রথম জিজ্ঞাসাবাদের সময়েই পুলিশের এলোপাথারি প্রহারে, তার একটা কানের পরদা হয়তো ছিঁড়ে গিয়েছিল। যেমন চলবার সময় তার নীচের বস্তিদেশ সবসময়ই একটু এগিয়ে থাকে, হাঁটলেও যন্ত্রণা হয়।' 'শরীরে তখন অসহ্য যন্ত্রণা। বিশেষ করে গুহ্যদ্বারে সেখানে একটা মোটা রুলের অনেকখানি ঢুকিয়ে চাড় দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে রক্তপাত হচ্ছিল।' প্রথমে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেও পরে অনেক বেশি সংগঠিত ও সুপরিকল্পিত ভাবে পাহাড়ের উত্তর থেকে পশ্চিম ঘিরে দক্ষিণের সমতল শিলিগুড়ি, বিহারের সীমানা থেকে প্রতি-আক্রমণ করে পুলিশ বাহিনী, দার্জিলিং জেলার মিরিক থানার নীচুতে এক বনাঞ্চলে প্রতি আক্রমণে ধরা পড়ে রুহিতন কুরমি। তারপর থেকেই তার দীর্ঘ কারাজীবনে এই অকথ্য অত্যাচারের শিকার সে। যেন সে একটা ধরা পড়া পাগলা দাঁতালো হাতি, শেকল পরানো। দীর্ঘ আট বছর জেল খেটেছে। রাতের অন্ধকারে বারবার এক জেল থেকে আর এক জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে গোপনে, কার্শিয়াং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং— রাতের পর রাত যায়, কোথায় যাচ্ছে জানা নেই, উদ্দেশ্য কী তাও জানা নেই, হত্যা নাকি মুক্তি, নাকি মুক্তির সুযোগ, কিছুই জানা নেই। একটা আশা, একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ কি ঘটবে? নাকি চিরকালের জন্য লোপাট করা হবে তাকে, জানা নেই। নিঃসঙ্গ রুহিতনের 'ব্যক্তি আমি' প্রতি মুহূর্তে ফিরে যেতে চেয়েছে তার চেনা জীবনের বৃত্তে, চেনা জীবনের গন্ধে। দক্ষিণ-তরাই-র নকশাল বাড়ির চা বাগানের কাছেই চুনীলাল মৌজায় ফেরার জন্য তার অন্তর উন্মুখ হয়ে থাকে—'মেচি নদীর দূর তীরের জঙ্গল উত্তর আর দক্ষিণ আর পশ্চিমের তরাইয়ের দিগবিসারি কর্ষিত ভূমি, জঙ্গল আর ঝোরার কলকলানি অষ্টপ্রহর হাতছানি দেয়।' দীর্ঘ আটবছর কয়েকমাসের কারাজীবনে বেশিরভাগই তাকে নিঃসঙ্গ করে রাখার প্রচেষ্টা চলেছে, বন্ধু বিপ্লবী সঙ্গীদের থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে সচেতনভাবে।

এর ভেতরই রুহিতন দেখছে তার চেনা বিপ্লবের জগৎটাকে বদলে যেতে। জেল জীবনের স্থানান্তরকালে কলকাতার জেলে হঠাৎই সাক্ষাৎ ঘটে একসময়ের সহযোদ্ধা, বিপ্লবী, বিদ্রোহী নেতা খেলু চৌধুরীর সঙ্গে। অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতেই উচ্ছ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারে না কেউই। খেলু চৌধুরী নেপালে পালিয়ে গিয়ে ধরা পড়েছিল। এরাই তো পথ দেখিয়েছিল রুহিতনদের। এদের সঙ্গেই তো শুরু। খেলু চৌধুরীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে রুহিতন। রুহিতনকে পেয়েও বন্দীদের অধিকাংশের চোখগুলোই বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠেছিল—

> '' 'সেই রুহিতন কুরমি? নকশালবাড়ির? এই মানুষকে কোনওদিন দেখতে পাব ভাবিনি, জীবনটা সার্থক হয়ে গেল। কমরেড রুহিতন কুরমি জিন্দাবাদ।'
>
> 'মনে রেখো কে এসেছে। এর নাম রুহিতন কুরমি। এই ওয়ার্ডে মহাত্মা গান্ধী ছিল। রুহিতন কুরমিও এসেছে।'

‘কুরমি, তুমি আমাদের কাছে তার চেয়ে অনেক বড়।’

‘রুহিতন কুরমি যুগ যুগ জীও।’

‘পিটিয়ে মেরে ফেললেও আমরা রুহিতন কুরমির নামে শ্লোগান দেব’।”

তবে তাদের এই উচ্ছ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। রুহিতনের অজান্তেই কখন তাদের সব উচ্ছ্বাস শেষ হয়ে যায়। তার চারপাশের ভিড় হাল্‌কা হয়ে যায়। এইখানেই খেলু চৌধুরীর কাছে রুহিতন জানতে পারে দিবাবাবুর মৃত্যুর খবর। এ সংবাদে একেবারে ভেঙে পড়ে রুহিতন—

> ‘‘তার সব থেকে পুরনো সংগ্রামী বন্ধু, যে তাকে প্রথম নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। নতুন জীবনের সেই স্বপ্ন কদাপি বিফল হবার নয়। সেই সফল স্বপ্নে, অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পায়। বোবায় কথা কয়। বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়। ভূমিহীনে ভূমি পায়। জনমজুরে রাজ্য চালায়। ...রুহিতন কুরমির সাবালক জীবনে এই প্রথম শোকের আঘাত।” [২৬]

খেলু চৌধুরীরা যখন দিবাবাবুর গায়ে শ্রেণিশত্রু-র তকমা লাগায়, রুহিতন স্থির থাকতে পারে না। প্রতিবাদ করে—‘খেলুবাবু, দিবাবাবুকে তুমি নেতা মেনেছিলে’, ঝেঁজে উঠেছিল খেলু চৌধুরী ‘এখন আর মানি না।’ ‘সে নিজে ছিল শ্রেণীশত্রু। তাই শেষপর্যন্ত সে পার্টিকে ভুল পথে চালিয়েছিল।’ কিন্তু রুহিতনের মনে প্রশ্ন জাগে ‘পার্টিকে ভুল পথে চালানো? আগে কেউ বুঝতে পারেনি? নাকি দিবাবাবুর নেতৃত্ব সফল হয়নি বলে, আজ তার মরা নিয়ে টানাটানি?’ তবে প্রাণ থাকতে রুহিতন নিজে দিবাবাবুকে ‘শ্রেণীশত্রু’ ভাবতে পারবে না। তাই রুহিতনের করুণ আর্তনাদ—‘কিন্তু খেলুবাবু দিবাবাবু আমাদের নেতা ছিল। তার জন্য আমার মন চিরকাল পুড়বে হে, মিথ্যা বলব না।’ এরপর থেকেই রুহিতনের প্রতি সকল বন্দীদের চোখমুখের ভাবভঙ্গি বদলে যেতে থাকে, এখানে নকশাল আন্দোলনের কর্মীদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের চিত্রটি স্পষ্ট হয়েছে। দিবা বাগচীর চরিত্রে অনেকে সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদারের ছায়া দেখতে পান। উপন্যাসে দিবা বাগচি চরিত্রটির মতোই—

> ‘‘নকশাল আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি কৃষক আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিলে এবং তিনি জোতদার শ্রেণির বিপক্ষে হলেও আসলে তিনি ছিলেন জোতদার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাঁর নামে বেনামী জমি থাকার অভিযোগ অনেকাংশে সত্য। ফলে শ্রেণীশত্রু খতমের প্রধান নেতৃবর্গের অন্তর্গত চারু মজুমদার নিজেও ছিলেন জমিদার জোতদার শ্রেণির। চারুর মাতামহ চন্দ্রমোহন রায় ছিলেন জোতদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।” [২৭]

এছাড়া চারু মজুমদারের চেহারার সঙ্গেও দিবা বাগচীর চরিত্রটির চেহারার মিল আছে। আর চারু মজুমদারের বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রভাবেও প্রভাবিত দিবা বাগচীর চরিত্রটি। চারু মজুমদার ১৯৬৭ সালের ৭ই জুন একটি চিঠিতে লিখেছেন—

> ''মনে রাখা দরকার কৃষিবিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে—এই বিপ্লবে কে জিতবে তা নির্ভর করছে কত দৃঢ়ভাবে আমরা আঘাত করতে পারছি তার উপর গ্রাম দিয়ে জোতদার শ্রেণিকে উৎখাত করতে হবে। দরকার হলে ঘরে আগুন দিয়েও তাদের তাড়াতে হবে।" [২৮]

চারু মজুমদার চারবার জেলে গেছেন, আর দিবা বাগচী জেল খেটেছে ১৯৪৭-১৯৪৯, দুবছর। খেলু চৌধুরী চরিত্রে সত্তর দশকের নকশাল নেতা সত্যনারায়ণ সিং ও অসীম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ চরিত্রের ছাপ আছে বলে মনে করা হয়। আর উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রুহিতন কুরমি চরিত্রে নকশাল আন্দোলনের বিশিষ্ট যোদ্ধা জঙ্গল সাঁওতাল চরিত্রের প্রভাব আছে। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায়—

> ''জঙ্গল সাঁওতালের বাবা কান্না কিসকু ছিলেন কমলপুর চা বাগানের একজন চা শ্রমিক। বাবার মৃত্যুর পর জঙ্গল সাঁওতাল তার মা ও তিন ভাই এক বোনকে নিয়ে চলে আসে নকশালবাড়ি এলাকায়। সেখানে সে দুর্লভ মহম্মদ নামে একজন জোতদারের বাড়িতে ভাগচাষি হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে। মেহনতী মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ, অসাধারণ সাহস, অকৃত্রিম নিষ্ঠা, সীমাহীন আনুগত্য, অকল্পনীয় পরিশ্রমে সে পৌঁছে গিয়েছিল নেতৃত্বের প্রথম সারিতে। জঙ্গল সাঁওতাল ছিল শ্রেণি সংগ্রামের অগ্রগামী সৈনিক। গভীর রাজনৈতিক তত্ত্বজ্ঞান তাঁর ছিল না, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তত্ত্বের মর্মবস্তুটি চিনে নেওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর ছিল। রুহিতন কুরমির ব্যক্তি চরিত্রের সঙ্গে জঙ্গল সাঁওতাল-এর অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬৮ সাল নাগাদ জঙ্গল সাঁওতাল ধরা পড়ে এবং জেল হয়। জঙ্গল সাঁওতাল-এর কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল এবং তাঁকে আলাদা করে জেলের 'লেপার ওয়ার্ড'-এ রাখা হত।" [২৯]

উপন্যাসে দেখা যায় আট বছরের জেল-জীবনে রুহিতন কুরমিও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। রুহিতনের সহকর্মী বন্দী অর্থাৎ খেলু চৌধুরীর দল তাকে অন্য ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করতে চায়। 'তুমি নীচের ওয়ার্ডে থাকবে এখন থেকে। ডাক্তার বলেছে, তোমার আলাদা থাকা দরকার।' আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় রুহিতন। তার রোগ সম্পর্কে রুহিতনের কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই—'তার হাতে, পায়ে মুখে শুকনো ঘায়ের কথা সে জানে। তার লাল দগদগে চোখের পাতা, নাকের ডগা ফুলে ওঠা, মাঝখানটা বসে যাওয়া, মুখের চামড়া আস্তে আস্তে মোটা হয়ে ওঠার কথা সে জানে। হাতপায়ের আঙুলের ডগাগুলোও কেমন লাল আর ক্ষয়া ক্ষয়া...কিন্তু দোষ কীসের? বন্ধুদের কাছ থেকে চলেই বা যেতে হবে কেন?'

খেলু চৌধুরী রুহিতনের চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ এনে আক্রমণ করে তার বাল্য-শৈশব-যৌবনকালকে। ইঙ্গিতে সন্দেহ প্রকাশ করে যে তার যৌনব্যাধি হয়েছে।—'বাপ

ঠাকুর্দার রোগ পেয়েছ, না নিজেই বাঁধিয়েছো, তা তুমিই জানো। মোহন ছেত্রীর ছেলে বড়কা ছেত্রীর সঙ্গে ত একসময়ে অনেক মজা ফুর্তি করেছ।... মনে করে দেখ তখন আরও কী কী ফুর্তি করেছ। মদ পচুই হাঁড়িয়া গিলেছ, আর বড়কা ছেত্রীর টাকায় লুবু খাঁকড়ির (নরম বা মেয়ে কাঁকড়া) সঙ্গ করেছ। এখন সেই খাঁকড়িরা সব রক্তে ফুটে উঠেছে।' আশ্চর্য হয়ে যায় রুহিতন। অবাক হয়, কারণ সে জানে সাঁওতাল, কুরমি, ওঁরাও মুণ্ডা চা বাগানে জোতে কাজ করে তারা টাকা দিয়ে মেয়ে মানুষের সঙ্গ কি তা জানে না। 'তোমার হিসাব নেই, আমাদের দুঃখী মেয়েগুলোকে কারা কিনতে চায়?' রুহিতনের স্খলিত অবাক স্বরে চিৎকার নেই, গর্জন নেই, কেবল যেন বুকের ওপর দায়ের কোপ পড়ে। ছেলেবেলায় শোনা মায়ের গাওয়া গানের কলি আওড়াতে থাকে মনে মনে—

''উত্তরে উনাইল ম্যাঘ
পচ্ছিমে বরষিল গ!
ভিজি গেল গাবানি কাপড়।''

জীবন এখন রুহিতনের কাছে অন্য অর্থ বহন করে আনে। যেখানে উত্তরে মেঘ ঘনালে পশ্চিমে বর্ষায়। আগুন জ্বলে বন্দী রুহিতনের বুকে যে-আগুনে বুকের ঝোরায় জল ঝরে। কিন্তু ডাক্তার জানায় তার রোগ 'ফুল অ্যানেসথেসিয়া' যাকে বলে লেপ্রসি। ডাক্তারের দৃষ্টিতে একপ্রকার সম্ভ্রমবোধ রুহিতনের প্রতি। কারণ সে নকশাল আন্দোলনের বীর যোদ্ধা, সাধারণ বন্দী নয়। কিন্তু তার সহকর্মীরা তাকে সে মর্যাদা দেয় না, রোগগ্রস্ত রুহিতনকে খেলু চৌধুরী বলেছে—'তুমি তো আর চিরকাল এই রুহিতন কুরমি ছিলে না।' আর রুহিতনের প্রাণে রাগের থেকেও যন্ত্রণা অনেক বেশী।—'এতকালের পুরনো লোকটা, একটা নেতা লোক, এমন করে দাগা দেয়? এতকালের চেনা সব মিথ্যা।' অবিশ্বাস, চূড়ান্ত অবিশ্বাস যা ওদের আন্দোলনকে ভেতরে ভেতরে শেষ করে দিয়েছিল, নষ্ট করেছিল একতাকে।

কলকাতার জেলে, বন্দী কুষ্ঠ রুগিদের সীমানায় এক বছর কয়েক মাস কাটানোর পর অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি পেল রুহিতন কুরমি। 'রুহিতন কুরমির ছুটি হয়ে গেল'—একথা সহজে বোধগম্য হয় না। 'রুহিতনের বুকের কাছে একটা কথাই বাজছিল, ছুটি! ছুটি! কোথায় যাবে রুহিতন? এ কীসের ছুটি? এই ধরণের ছুটির কথা সে কখনও ভাবেনি, চায়নি, মনে কোনও প্রস্তুতিও নেই।' কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে সত্যি কি সে ফিরতে পারবে চুনীলাল মোজায়, সেই জোতে, যেখানে মঙ্গলা ছেলেমেয়ে মা, সেই মুক্ত এলাকায়। ফিরে চলেছে রুহিতন 'কিন্তু শিলিগুড়ি শহরটাকে তো যেন চেনাই যায় না। আট-সাড়ে আট বছরের মধ্যে সমস্ত কিছুই এত বদলিয়ে গিয়েছে রুহিতন বেশ খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। অনেক জায়গার চেহারা সে

চিনতে পারেনি। তাকে চিনতে পারেনি সারা পথের একটা মানুষও'—সব কিছু বদলে গেছে। অথচ রুহিতন জানে এ রকম হওয়ার কথা ছিল না। যে মুক্তাঞ্চলের জন্য তারা সারাজীবন পণ করে লড়াই করেছিল, যে মুক্তাঞ্চলের স্বপ্ন দেখেছিল তারা, বাস্তবে তার অস্তিত্ব খুঁজে পায় না আর। জঙ্গলের রাস্তায় নতুন নতুন বাড়ি চোখে পড়ে তার কিন্তু বাড়ির মালিক কারা জানে না। উঁচু কাঠের মেঝের ওপরে ঝকঝকে বাড়িগুলো দেখলেই মনে হয়, নতুন বড়লোকেরা কেউ কেউ এদিকে এসে বাস করছে। রুহিতন সব থেকে অবাক হয় তাকে আপ্যায়ন করে নিয়ে যেতে এসেছে রুকনুদ্দিন আহমেদের ভাই কাছিমুদ্দিন। যে রুকনুদ্দিন রুহিতনদের দলের হাতে নিহত হয়েছিল। শনিলালের ছেলে বরালাল যে শনিলাল ওদের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। আচ্ছালাল, নরসিং ছেত্রী যারা ওদের নির্বাচিত শ্রেণিশত্রুর প্রতিনিধি। রুহিতন বিস্মিত হয়ে দেখল যাদের জন্য ওর লড়াই সেই গরীব সাধারণ মানুষ, সাঁওতাল-ভূমিজ মুণ্ডা-কুরমি-ওঁরাও কেউই আসেনি। যারা এসেছে, তাদের সে চেনে না। রুহিতন যেন গন্ধের দ্বারা বুঝতে পারছে এরা কেউ তার জগতের লোক নয়। বাস্তবের বিপরীত কীর্তি দেখে রুহিতনের মনে হয়েছে সময়ের কি কোন কাণ্ডাকাণ্ড বোধ নেই।

তবে রুহিতন সব থেকে বেশি আশ্চর্য হয়েছে তার নিজের পরিবারের পরিবর্তন দেখে। দুই ছেলে বুধুয়া আর কুরমা তাকে চিনতেই পারে না। তাদের পরিবর্তন দেখে রুহিতন অবাক। 'কুরমি মাহাতোর ছেলে! দেখে মোটেই বোঝা যাচ্ছে না। বড়কা ছেত্রীর মতো পাতলুন পরা, হাওয়াই শার্ট গায়ে। পায়ে দুজনেরই রবারের স্যান্ডেল। দুজনের মাথায় জবজবে করে তেল লাগিয়ে আঁচড়ানো। বুধুয়ার বাঁ হাতের কবজিতে একটা ঘড়ি,... দুজনের দৃষ্টি দেখে মনে হল, রুহিতনকে ওরা চিনতে পারছে না'। রুহিতনের অবাক হবার পালা নিজের বাড়ির বদল দেখে, তার পরিবার পরিজন তার বাবার আমলের 'কোমর ভাঙা বুড়ো মানুষের মত' ঘর ছেড়ে এখন থাকে জোতদারের মতো বাড়িতে। 'রুহিতন অবাক হয়ে সেদিকে তাকাল কালো আলকাতরা দিয়ে কাঠের আর মাথার টিনের গায়ে রং করা। ঘরের পাটাতনের মেঝে মোটা মোটা শালবল্লার খুঁটির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। বলতে গেলে প্রায় জোতদার মহাজনের বাড়ির মতোই। ...প্রায় মোহন ছেত্রীর বাড়ির মতো যেখানে মুক্ত এলাকার খাদ্যভাণ্ডার ধর্মগোলা করা হয়েছিল।' তার ছেলেরা এখন ব্যস্ত শিলিগুড়িতে কে একজন দিল্লীর মন্ত্রী আসবে তাই নিয়ে। ওরা এখন কাছিমুদ্দিনের সঙ্গে ঝাণ্ডা নিয়ে বেড়ায়। কাছিমুদ্দিন রুহিতনকে জানাল সরকার তার পরিবারকে চাষের জমি দিয়েছে, কারণ 'তুমি হলে রুহিতন কুরমি।' তাই এখন তার পরিবারের 'চেহারাটা মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থের'। সমস্ত ব্যাপারটা রুহিতনের কাছে যেন অবাস্তব লাগে। তবে রুহিতন সবচেয়ে অবাক হল স্ত্রী মঙ্গলা, তার মঙলির পরিবর্তন দেখে। তার সাজবেশের সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিকতার বদল। মুক্তাঞ্চল গড়ার সময় মঙ্গলা কী করেছিল। তার বউ? মনে প্রাণে মাহাতোদের মেয়ে হয়েও মুক্তাঞ্চলের মধ্যে এক ডাইনি পোড়াবার ঘটনায় ভীষণভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সেই

মঙ্গলা এখন আবার তার পুরোনো ভাবনায় ফিরে এসেছে মারাংবুরুর দয়ায় বিশ্বাস করে। রুহিতনের সন্দেহ হয়, সে কি তবে এখন ডাইনি পোড়ানোতেও বিশ্বাস করে? মঙ্গলা সেই দিনগুলো আর মনে করতে চায় না। কিন্তু রুহিতন স্মরণ করিয়ে দেয়—'মঙ্‌লি, সেইসব দিনের কথা তোর মনে আছে তো? আমাদের সেই স্বাধীন অঞ্চলের দিনগুলোর।' রুহিতনের বেদনার সীমা অতিক্রম করে যখন সে জানতে পারে তার পুত্র পরিজন এবং স্ত্রী মঙ্গলা পর্যন্ত তাকে ব্রাত্য করে দিয়েছে। সে জেনেছে মঙ্গলাও জীবনের স্বাভাবিকতায় তাকে আর গ্রহণ করবে না। পুত্রদের মতো স্ত্রীর চোখেও সে দেখেছে ঘৃণার দৃষ্টি। অসুস্থ রুহিতনের আশ্রয় এখন তার ভেঙে পড়া, বাতিল করে দেওয়া পুরনো ঘরে। মঙ্গলা তার খাবার, প্রয়োজনের আসবাব নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে তাকে, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। বলেছে 'কেন, তোমার থাকবার ব্যবস্থা করেছি একটা খাটিয়া দিয়েছি। এসো দেখবে। চালাটাও বিন্না ঘাস দিয়ে নতুন করে পুব দিকে ছেয়ে দিয়েছি। তোমার থালা বাসন জলের বালতি সব রেখে দিয়েছি।'

বিচ্ছিন্ন রুহিতন আবার নিঃসঙ্গ। সে দেখল, জেলের থেকেও বাইরের বাস্তবতায় অসংগতি যেন অনেক বেশি। কিন্তু সত্তরের যোদ্ধা রুহিতন কুরমি তো এ জীবনের কথা কোনোদিন ভাবেনি, সে তো হেরে যেতে জানে না। তার স্বপ্ন, তার বিপ্লব, বিদ্রোহ এত সহজে বিলীন হতে পারে না। রুহিতন বিশ্বাস করত গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা যায়। যারা করত, অটল বিশ্বাসেই তারা সব চুরমার করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন তার অন্য একটা বিশ্বাসের জগৎও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। মনে পড়ে যায় মঙ্গলার গল্প, মায়ের গাওয়া গান। অন্ধকারের ভেতর আবার উঠে দাঁড়ায় রুহিতন কুরমি। এভাবে সে তার আন্দোলন, তার স্বপ্নকে শেষ হতে দেবে না। অবশিষ্টকে অবলম্বন করে আবার সে বাঁচবে। জীবনের সব গ্লানি পিছনে ফেলে গভীর রাত্রে নিকষ কালো অন্ধকারে অধিকারী বাবার দিঘির পাড় ধরে হেঁটে চলে, রোগগ্রস্ত, নিঃসঙ্গ যোদ্ধা রুহিতন কুরমি।

> ''সেই জঙ্গলের একজায়গায়, মাটির নীচে, রুহিতন শেষ সম্বল হিসেবে কিছু জিনিস রেখেছিল। এখনও কি তা আছে। ... রুহিতন হেঁটে চলেছে। অনেক দূরের পথ। ময়নাগুড়ি মৌজা... পথের যেন শেষ হতে চায় না... পূবের আকাশ কি ফরসা হয়ে আসছে?... অর্জুন গাছটাকে সে দেখতে পেল। গাছটা আছে! তা হলে হয়তো সবই আছে। ...কিন্তু শাবল, কোদাল কিছুই তো নেই সঙ্গে? ...একটা গাছের ডাল চোখে পড়ল... তার বুকের মধ্যে যেন ঢাকের বাদ্যি বেজে উঠল। আছে আছে সেই পাথরের চিহ্নটা আছে।... তারপর দু থাবায় গাছের ডাল দিয়ে মাটি খোঁচাতে লাগল। এত শক্ত? যেন পাথর! কিন্তু তাকে থামলে চলবে না।... সেই মুহূর্তেই চোখে পড়ল, সেই জিনিসের একটা অংশ। রুহিতন দু-হাত ঢুকিয়ে, মুখ থুবড়িয়ে পড়ে, বন্দুকের বাঁট থাবায় চেপে টানল, সহজে ওঠবার নয়। অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে, ডবল ব্যারেল একটা বন্দুক বেরিয়ে এল ... তার সঙ্গে কতগুলো টোটা। থাবায় তুলে টোটার গন্ধ শুঁকল। ...সে বন্দুকটা তুলে নিল।'' [৩০]

নকশাল আন্দোলনের কিছু কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের ফলে দলের অভ্যন্তরীণ ভাঙন ধরে। রুহিতন মনে মনে বিভ্রান্ত হলেও স্থির বুঝেছিল তাদের সেই জগতের নানান জায়গায় ভাঙচুর, ফাটল ধরেছে। নিজেদের মধ্যে ঘৃণা আর রাগ, তাদের আন্দোলনকে ভুল পথে চালনা করছে। তাই বেশিরভাগ মানুষই তাদের উত্থানের সেই সময়টাকে চিহ্নিত করেছে খুন খারাপির বছর বলে। জীবন পণ করে যে লড়াই রুহিতনরা লড়েছিল, তার চরম ব্যর্থরূপ লক্ষ করেও সে একেবারে ভেঙে পড়েনি। জেল-জীবনে যেমন সে তার অতীত জীবনের সুখের কথা স্মরণ করে বন্দী জীবন কাটিয়েছে, তেমনই চুনীলাল মৌজায় তার কাঙ্ক্ষিত জগতে ফিরে এসে বাস্তবের বিরুদ্ধাচারের সম্মুখীন হয়ে আবার ফিরে যেতে চেয়েছে তার অতীত বিদ্রোহের, যুদ্ধের দিনগুলিতে। মাটি খুঁড়ে বের করে এনেছে তার যুদ্ধের অস্ত্র। জঙ ধরলেও আজও তা সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে যায়নি। মুক্তাঞ্চল গড়ার স্বপ্নের মতো বিলীন হয়ে যায়নি। রুহিতন তাই শেষবারের মতো স্বভূমে ফিরে যেতে চায় প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে। ব্যবহার করতে চায় শেষ সম্বল যুদ্ধের অস্ত্রটিকে। —

> ''রুহিতন তার ডান হাতের তর্জনীর অবশিষ্ট তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে ট্রিগারে রাখল। বুকের কাছে বাঁট চেপে, ট্রিগারে ক্ষয়প্রাপ্ত তর্জনী দিয়ে চাপ দিল। জঙ ধরার একটা শব্দ হল। কিন্তু ট্রিগার নড়ে উঠল। এই ক্ষয়প্রাপ্ত আঙুল এখনও ট্রিগার টিপতে সক্ষম! রোদ খাইয়ে শকোলে কি আবার এ বন্দুক চালানো যাবে? টোটাগুলো কাজ করবে? ব্যারেলের মুখ থেকে মাটি বের করে দিলে, গুলি বেরোবে? সে হাঁফাচ্ছে। ...বুকের মধ্যে নিশ্বাস রাখবার জায়গা নেই যেন। সে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। বন্দুকটা রইল তার বুকের পাশে মাটিতে। কাত হয়ে মাথাটা রাখল জোড়া ব্যারেলের ওপর, পুচ্ছহীন লাল চোখের পাতা বুজে এল। তার মনে এখন একটিমাত্র সান্ত্বনা, সে অপমান আর অভিশপ্ত আশ্রয় থেকে নিজের যথার্থ জায়গায় ফিরে এসেছে, সে বুঝতে পারছে গভীর ঘুম আসছে তার।'' [৩১]

তার স্বপনের ভূমিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মহাকালের রথের ঘোড়া রুহিতন কুরমি। পাঠক এবার সেই স্বপ্নভূমিতে স্মৃতি হাতড়ে বেড়াবে সেদিন পর্যন্ত যেদিন ইতিহাসের গর্ত খুঁড়ে আবার বের করা হবে সুষুপ্ত ব্যারেল। পাঠকের বিস্মৃত কল্পনায় ততদিন চলবে, সেই অন্বেষণের প্রয়াস।

মহাকালের রথের ঘোড়া হল নকশাল আন্দোলনের এক মহান যোদ্ধার বিফল স্বপ্নের, ব্যর্থ জীবনের হৃদয়দ্রবী কাহিনি। উপন্যাস শুরুতে লেখক একটা কবিতায় বলেছেন—

> ''দলীয় বিশ্বাসে বিশ্বস্ত
> সমর্পিত-প্রাণ নেতাদের প্রতি

লড়েছিল জান কবুল কী নাম ওদের? শহীদ?
অতীতেও লড়েছিল ওরা মরেছিল নামহীন
তারো পরে হাজার হাজার বছর
বহু মত ও পথের সিদ্ধান্তে
নয়া নয়া নীতির ধ্বজা ঘাড়ে
লড়ে চলেছে ওরা নামহীন আঠারো অক্ষৌহিনী।
বিশ্বস্ত প্রশ্নহীন যোদ্ধারা লড়ে চলে
লেখা হয়ে চলে ইতিহাস।
ধ্বংস আর নব-নির্মাণের মাঝে
অখ্যাত সেই কোটিদের নাম কী।

যেন দেখি নিরন্তর
ছুটে চলে মহাকাল।
বিশ্ব নিয়মের অধীন ওরা অশ্ববাহিনী
চিরকাল টেনে চলে রথ।"

উপন্যাসের শুরুতে লেখক বলে নিয়েছেন তিনি ঐতিহাসিক নন, তিনি সাহিত্যিক। তাই ইতিহাসের অনুপুঙ্খ বর্ণনা তিনি উপন্যাসের ভেতর দেননি। নকশাল আন্দোলনের প্রবল জোয়ার শেষ পর্যন্ত হয়তো কোনো স্বপ্নের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি, কিন্তু সমরেশ বসু উপন্যাসে রুহিতন কুরমির মতো সহজ-সরল-আত্মপ্রত্যয়ী সংগ্রামী যোদ্ধাদের স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে রূপায়িত করেছেন। রুহিতনের মতো বিশ্বস্ত, প্রশ্নহীন যোদ্ধারা চিরকাল কেবল লড়েছে জীবন পণ করে। কিন্তু পায়নি কিছুই, তাদের লেখক বলেছেন মহাকালের রথের ঘোড়া। কালের যাত্রার পথ বড় জটিল। তাই ইতিহাসও তাদের মনে রাখে না, লিখে রাখে না। 'অখ্যাত সেই কটিদের নাম', নামহীন সেই বিশ্বস্ত যোদ্ধারা তাদের নেতাদের কথায় যুগ যুগ ধরে লড়াই করেছে, মৃত্যুকে বরণ করেছে, কিন্তু তারা শহীদের মর্যাদা পায়নি অথচ এরাই চিরকাল মহাকালের রথ টেনে নিয়ে চলে। সমরেশ বসু তুলে আনলেন সেই লড়াকু জীবনের সংগ্রামকে, ইতিহাসও যাদের প্রান্তিক করে রেখেছে।

এই দশকের অভিজ্ঞতা ও তাৎপর্য বিষয়ে মহাশ্বেতা দেবী পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন—

"আমাদের দেশে এই দশক বিষয়ে অভিজ্ঞতা খুবই দ্যোতক। নকশাল আন্দোলনে মধ্যবিত্তের ঘরে জোর টান পড়েছিল। যে কারণে এই প্রথম ভদ্রলোকদের মনে নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শহরে আন্দোলনের শুরু হওয়াতে ঘটে এই তাৎক্ষণিক

বিপর্যয়। নইলে কৃষিজীবী নিরন্ন মানুষের সংগ্রাম মধ্যবিত্তকে কোনদিনই বিচলিত করেনি। এখনো তা করে না। কিন্তু ঘরের ছেলেরা জড়িত, চোখ একেবারে বুজে থাকাও যায় না। ... সত্তর থেকে বাহাত্তর পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গা ও কলকাতা যখন রক্তাক্ত হচ্ছিল, তখন পেশাদারী সাহিত্যিকরা কতখানি নীরব ছিলেন, সবাই জানেন। প্রত্যেকে নন, তবে প্রায় সকলেই। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য বারবার বলেছি এই আনইনভল্‌ভমেন্ট এক ক্ষমার অযোগ্য অবিবেকী পাপ। যখন সৈন্য, সি.আর.পি.— প্রশাসনী মস্তানরা দেশকে এক রক্তাক্ত বধ্যভূমি করে আইন ও শৃংখলা পুনর্বাসিত করল তখনও সবাই চুপচাপ।"

সত্তর দশকের ঘটনা এবং সাহিত্য আলোচনা থেকে বলা যায় যে নকশাল আন্দোলনের পুরোনো রাজনৈতিক অভ্যাসগুলো সাহিত্যে পুনরায় ফিরে এল এবং শ্রেণি-সংগ্রাম ক্রমশ সংস্কারবাদী রূপ পেল। এই সময়ের লেখকদের লেখায় রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্নতার বেদনা প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু সত্তরের যে-ক্ষত চিহ্নিত হয়ে আছে ওদের লেখায় সে-আঘাত অনেক দিন শুকায় নি। সত্তরের সাহিত্য প্রমাণ করল—অশিক্ষা আর অসভ্য জীবনের পঙ্কে নিমজ্জিত নিম্নবর্গের মানুষের জীবন কখনোই একই খাতে বয়ে যায়নি। যুগের পরিবর্তন বিশেষ করে রাজনৈতিক পালা বদল এবং অর্থনৈতিক সংকট তাদের নিস্তরঙ্গ বদ্ধ জীবনে বারবার ঢেউ তুলেছে। সত্তর দশকের রাজনৈতিক ঘটনাগুলি লেখকদের মনকে নাড়া দিয়েছিল বলেই তাদের কথাসাহিত্য দেখালো আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই আজও নিরন্ন; অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষগুলি নিজেদের ভাগ্য আর ভগবানের দোহাই দিয়ে তিল তিল করে মরে যাচ্ছে। আর একদল মানুষ এদের শোষণ করে এদের শ্রমের ফসল নিজেদের কব্জা করে মুনাফা লুটছে। সত্তর দশক আর এক দলের পরিচয় এনে দিল যাঁরা শ্রেণি-সংগ্রামকে জীবনের বীজমন্ত্র করে আত্মস্বার্থ বিসর্জিত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শোষিত বঞ্চিত মানুষের স্বার্থে।

অনিঃশেষ বিপ্লবের কাহিনি— অপারেশন? বসাই টুডু

সত্তর দশক প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন 'লেখক হিসেবে আমি সময়টির প্রাপ্য দলিলীকরণে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি মাত্র : ... পেশাদারী লেখককেও তার অবস্থানকে ন্যায্য মর্যাদা দিতে হলে এমন এক সময়কে দলিলে ধরে রাখতে হয়।' 'অপারেশন? বসাই টুডু' উপন্যাসটিকেও আমরা সেই সময়ের দলিল রূপেই দেখতে পারি। মহাশ্বেতা দেবীর অগ্নিগর্ভ নামক গ্রন্থ সংকলনের প্রথম কাহিনি 'অপারেশন? বসাই টুডু'। বইটির ভূমিকায় লেখক বেশ কিছু কথা বলে নিয়েছেন শুরুতেই। তিনি যে-উদ্দেশ্য নিয়েই একটা সময়ের কথা বলতে চেয়েছেন তা জানিয়েছেন—

> ''পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষে কৃষকশ্রেণীর (মুখ্যত ভূমিহীন কৃষকের, যাদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় পাঁচ কোটি এবং সমস্ত দেশের শ্রমজীবী মানুষের আনুপাতিক হার অনুযায়ী শতকরা ২৬.৩৩ ভাগ) বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের ইতিহাস সমকালীন ঘটনামাত্র নয়। আধুনিক ইতিহাসের পর্বে পর্বে তার অভ্যুত্থান প্রয়াস, তাদের প্রতি অন্য শ্রেণির যে শোষণের চরিত্রকে উন্মোচিত করে, কালান্তরেও অদ্যাবধি তা প্রায় অভিন্নই থেকে গেছে। সন্ন্যাসীবিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ কাল থেকে কালে আরো আরো বিদ্রোহ থেকে শুরু করে আজকের নকশালবাড়ি আন্দোলন, প্রায় একই মৌলিক দাবির সোচ্চার কণ্ঠকেই ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছে''

লেখকের উদ্দেশ্য ইতিহাস হয়ে যাওয়া আর যা এই মুহূর্তে ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে (তাঁর সময়ে) সেই সকল বিদ্রোহ, বিক্ষোভ আর শোষণ— শোষক-চরিত্র-কাহিনির উপস্থাপন। কৃষক বিদ্রোহ থেকে বিচ্যুত হয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কিছু রাজনৈতিক কর্মী, আর কিছু কৃষকের সংগ্রাম। তারই কাহিনি 'অপারেশন? বসাই টুডু'।

'অপারেশন? বসাই টুডু' উপন্যাসের সময়কাল ১৯৭১—১৯৭৭। এই সময়কালে বা এর কিছু পূর্ববর্তী সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনগুলি সংঘটিত হতে থাকে। পূর্বে সত্তর দশকের রাজনীতি প্রসঙ্গে সেসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে প্রয়োজনের সূত্রে কিছু ঘটনার কথা আরও একবার বলা যেতে পারে। যেমন— ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগা আন্দোলন। উপন্যাসে বসাই ও কালীর আলোচনায় তেভাগা আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে। এই তেভাগা আন্দোলনে গরীব কৃষক ক্ষেতমজুররা অংশগ্রহণ করেছিলেন। গরীব কৃষক আর ক্ষুদ্র জমিখণ্ডের মালিকরা কৃষক সভার মধ্যে একত্রিত হতে থাকে। কৃষক সভার মধ্যে বাড়তে থাকে মধ্যকৃষকদের প্রাধান্য। ফসলের দুই তৃতীয়াংশ ভাগ ছিল তেভাগা আন্দোলনের মূল দাবি। তবে পরবর্তীকালে গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের এই সংগঠনে অংশগ্রহণ ও প্রাধান্যের ফলে এই আন্দোলনের চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়।—

> ''তিরিশের দশকের কৃষক আন্দোলন যেমন খাজনা, প্রজাস্বত্ব, ক্যানেল কর, মহাজনী ঋণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে শুরু হয়ে চল্লিশ দশকে ফসলের ভাগের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল, তেমনি ষাটের দশকে কৃষক আন্দোলনের লক্ষ্য দাঁড়িয়েছিল জমি, কাজ, মজুরি, খাদ্য, ঋণ ইত্যাদির দাবি অর্জন।''

৫০'এর দশকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনাধীন কৃষকসভার নেতৃত্বে ভূমি-সংস্কারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষকসভা আন্দোলন শুরু করে। ১৯৫৫ সালে কংগ্রেস সরকার বিধানসভায় প্রজাস্বত্ব আইন, বর্গাদার আইন উচ্ছেদ করে একটি ভূমি-সংস্কার বিল পেশ করে। ঐ বিলে জমির উর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণ, রাজস্ব বর্গাদার ও রায়তদের অধিকার বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হলেও

আইনে অনেক ফাঁকিও থাকে ভূমি-মালিকদের জন্য। ফলে তাতে বর্গাদার বা কৃষকদের কোনও উপকার হয় না। কৃষক সংগঠনগুলি তাদের অন্দোলন চালিয়ে যায়, বলা যায় ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে সি.পি.এম. এর সাফল্যের পেছনে, কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বন্টন, বর্গস্বত্ব, খাদ্য, কাজ, মজুরি ইত্যাদি নিয়ে কৃষক সভার মাধ্যমে যে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল তার অবদান ছিল অনেকখানি। কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্টের শরিক হিসেবে ক্ষমতায় এসে কিছু সংস্কারমূলক কাজের উদ্যোগ নেয়। তার মধ্যে জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ, খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ, ভাগচাষি বা বর্গাদারদের ভাগের অংশ বৃদ্ধি, এগুলি ছিল। কিন্তু দেখা গেল সি.পি. এম. শতকরা ৭৫ ভাগ ফসল বর্গাদারকে দেওয়ার প্রস্তাব করলেও জমি থেকে উচ্ছেদ কিছুটা বন্ধ করা ছাড়া আর কোনও প্রস্তাবই কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেনি।

অগ্নিগর্ভের ভূমিকা অংশে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন, নকশালবাড়ি আন্দালনের পিছনে আছে স্থানীয় জোতদারদের দীর্ঘকালীন 'আধিয়ার' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাষীর ক্ষোভ ও প্রতিবাদ। লেখক বলেছেন,

> ''এইরকম বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের প্রেক্ষিতেই ১৯৫৪ সালে সরকার 'এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট' পাশ করেন। এই আইনের মুখ্য বিষয় হল, কোনও ব্যক্তি মোট ২৫ একরের বেশি জমি রাখতে পারবেন না। এই আইন প্রণয়নের পেছনের শুভেচ্ছাতে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু কার্যকালে জমির মালিক সামান্য জমিই খোয়ান, বেনামে সমস্ত জমিই তাদের থেকে যায়। ১৯৭১ সালে, কৃষিজমির পরিবার ভিত্তিক সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে যে আইন (সংশোধিত) পাশ করা হয়, তাতেও কোন লাভ হয়নি। সকলেই জানেন আইনটিতে মেচো ঘেরি, চা বাগান, শিল্পকারখানা ইত্যাদি নামের আড়ালে হাজার হাজার একর কৃষিজমি লুকিয়ে রাখার বিরুদ্ধে কোনো কথা নেই।''

— ক্ষেতমজুর বা গরীব চাষি বুঝল তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। কৃষক সভা বা তার আদর্শ নেতৃত্ব আর তাদের স্বার্থের কথা ভাবছে না। সি.পি.এম. এর সমর্থনে যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে দল সেই জোতদার বা ভূমিমালিকের স্বার্থই দেখছে। তখন বিপ্লবী কৃষক দল তাদের নিজেদের স্বার্থে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করে এবং কৃষকসভাগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের প্রতিবাদ চালিয়ে যায়। নেতৃত্ব দেয় বাসাই টুডুর মতো ব্যক্তিত্ব। আর তত্ত্বের সঙ্গে জীবনের বিচ্যুতি দেখে আত্মদহনে দীর্ণ হয় কালি সাঁতরার মত আদর্শ মতবাদের আবেগে ভেসে জীবন উৎসর্গ করা কর্মীরা। দুই পথের মাঝখানে পড়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত লেখকের মতো এই সত্যে উপনীত হয় যে—

> ''জীবন অঙ্ক নয় এবং রাজনীতির জন্য মানুষ নয়, মানুষের স্বাধিকারে বাঁচার দাবীকে সার্থক করাই সকল রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত।''

উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসের ঘটনার উল্লেখে। জরুরি অবস্থার অবসান হয়েছে কেন্দ্রে এসেছে জনতা সরকার। বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার বিপুল সাংখাধিক্যে ক্ষমতায় আসে। সি. পি. আই (এম) পার্টি অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তবে ভোট-সর্বস্ব রাজনীতির স্বার্থে কিষান সভা ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছে। এইরকম একটি পরিস্থিতিতে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে সত্তরের দলিল। ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে কাহিনি ১৯৭৭এ শুরু হয়ে পিছিয়ে গেছে ১৯৭১ সালে। বলা যায় ১৯৭১—১৯৭৭এ গ্রামবাংলার জীবন বর্ণনার মাধ্যমে লেখক ধরতে চেয়েছেন সত্তর দশককে।—

> 'সময়টা ভালো নয় ... সত্তর সাল থেকেই সময়ের কলজেয় শুধু দমকলই ঘণ্টা বাজায়'।
> বা—
>
> '... সময়টি মন্দ ছিল, আদিবাসী অধ্যুষিত কোনো জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল-এর পটভূমি যার সদর শহর জাগুলা। গ্রামটি চরসা নদীকেন্দ্রিক কাহিনিকে প্রবাহমানতা দিয়েছে এই চরসা নদী আর তীরের গ্রামগুলির মানুষের জীবন-সংগ্রাম গ্রামটির উপর দিয়ে সত্তর-একাত্তর সাল বয়ে গেছে। 'সত্তর-একাত্তরে বসাইদের জন্য পরগণা জ্বলেছে এবং সে-সময়ে নিরন্ন নেংটে বনাম প্রশাসনের সশস্ত্র লড়াইয়ে ভারতের গর্বস্থান জওয়ানরা হামেহাল পর্যুদস্ত হয়েছে ... সে দশকের নাড়ীতে ছিল জ্বরের আগুন।'

'চরসা' নামটি তাই 'প্রশাসনের শরীরে দুষ্ট ব্রণ'। অনেক চেষ্টাতেও প্রশাসনের শরীর থেকে চরসা ব্যাধিটি নির্মুল করা যায়নি। সত্তর একাত্তরে মদত দেবার ফলে 'গ্রামটি প্রশাসনের চোখে সতীনপো'। চরসা নাম শুনলে বি.ডি.ও. বীজ দেয় না, রিলিফ গ্রামে ঢোকে না খরায়-আকালে, গাঁয়ের মানুষকে বাদ দিয়ে 'দাওয়াল' এসে জোতদারদের ধান কেটে মজুরি নিয়ে যায়। গ্রামের চারপাশ দিয়ে রিলিফের বান ভাসে কিন্তু গ্রামটির চেহারা শ্মশানের মতো। সত্তর একাত্তরে মদত দেবার ফলে চরসার এই হাল। এইসব কাহিনিই আবর্তিত হয় দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে : কালী সাঁতরা এবং বসাই টুডু।— 'কালী সাঁতরার জীবনে বসাই টুডু একটা অভিজ্ঞতা। একদা বসাইয়ের সঙ্গে সে কৃষক আন্দোলন করেছে। তারপর দুজনের মত আর পথ এক থাকেনি।' কাহিনিতে বসাই অতীত আর কালী বর্তমান। কালী সাঁতরার চেতনাপ্রবাহে বসাই কখনও বর্তমান হয়ে উঠেছে, জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আবার কখন অতীত, কখনও বা মৃত। বারবার কালী সাঁতরা যাত্রা করেছে মৃত বসাইকে শনাক্ত করতে, তার ভাবনার পথ ধরেই বসাই বিন্দু থেকে পরিণত হয়েছে সমগ্র বসাইয়ে। ১৯৭০—১৯৭৬ সাল অব্দি বসাই চারবার মারা গেছে। চারবারই তাকে শনাক্ত করার জন্য অন্যদের সঙ্গে কালী সাঁতরাকেও যেতে হয়েছে। শেষবার কালী যাত্রা করেছে চরসার উদ্দেশ্যে ১৯৭৭-জুলাই, এখান থেকেই কাহিনির সূচনা। মাতো ডোম, সময়ের রংরুট। সত্তর

দশকে দরকারি খবর সংগ্রহ করে থানায় পৌঁছানো এদের কাজ। মাতো ডোম থানায় খবর দিয়েছে চরসার জঙ্গলে— 'বসাই মরি যাছু'। এই খবর পেয়ে ৭৭ সালে কালী সাঁতরা আর অন্যদিকে এস.আই বসাইয়ের উদ্দেশ্যে চরসার দিকে যাচ্ছে। এখান থেকেই বসাই দুজন লোকের স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে উঠল। বসাই-র কোনও বিশেষ গ্রাম ঘর বাড়ি নেই। জন্মকালে মা, জন্মের পর বাবার মৃত্যু, পিসির কাছে ছ বছর অব্দি থেকেছে ভেলোগ্রামে। পিসির মৃত্যুর পর গোকুলবাবুর চেষ্টায় রাম্‌তা মিশনে বড় হয়েছে। তারপর জাগুলা। কিষান ফ্রন্টের কর্মী তিরিশ বছর ধরে। শতাধিক গ্রামে ঘুরে কাজ করার ফলে সর্বত্র সে ঘরের লোক। এহেন বসাইকে নিয়ে প্রশাসন বিভ্রান্ত।

১৯৪৫ সালে বসাই কিষান সভার সদস্য ছিল। বসাই আর কালীর পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অবলম্বন করেছিল 'শুধু সশস্ত্র সংগ্রাম বন্দুকের নল?'। পার্টিতে সূর্য সাউকে নিয়ে মতান্তর হলে দল ছেড়ে দিল বসাই। তারপরে সে যোগ দিয়েছে বীরু পাঠকের দলে। কিন্তু সে নকশাল নয়। পলতাকুড়িতে যে দুদিন কালী সাঁতরা বসাইয়ের সঙ্গে ছিল এবং যে-সময়টাকে কালী বহুদিন ভুলতে পারেনি। পার্টির নেতৃত্ব কালীকে পাঠিয়েছিল বসাইয়ের কাছে তার দলছাড়ার কারণ জানতে। সেই সময়ই বসাই কালীকে জানায় পার্টির প্রতি তার ক্ষোভের কারণ। বসাই বলে— 'ভূঞা জমিদার, সাউ মহাজন, বাবরি জোতদার। তিন যমের ডাউশে মার খাই নাই কবে মনে করতে পারি না।' ... 'বাপ নাই, মা নাই, পিসি মরতে নেংটা একা, ছ বছুরা টোকা। মিশনে সাহেবে ল্যিল সি ও গোকুলবাবুর কথায়' কিন্তু ... 'কংগ্রেস করছু কি পার্টি, ক্যাও ভুলে নাই ছুয়াছুত'। মিশন থেকে পালিয়ে আসে বসাই নতুন জামানায় সে পার্টির কর্মী। কিন্তু বসাই দেখেছে পার্টির বাবুরা সনতাল-কাওয়া-তিওররে ভাই ভাগ্না ভাবে তাই 'সামন্তবাবুর বাসায় তুমরা পিয়ালায় চা খেতে আমু মাটির ভাণ্ডে'।' বসাই বুঝেছে আসলে বাবু একটা জাত। বাগদী-কাওরার মতো একটা জাত, তাই পার্টির মধ্যেও থাকে বর্ণবিদ্বেষ। তবে বসাইয়ের পার্টি ছাড়ার পিছনে রয়েছে আরও অনেক কারণ। ১৯৪৫ সাল থেকে সে কিষাণ সভা করেছে—

> ''তিতাল্লিশ সালে জিলা কিষান সভার নকুলবাবু আমাদের ময়মানসিং লয়্যে যায়, নালিতাবাড়ি কন্‌ফারেন্সে। সিথা পয়লা দাবি উঠছিল, খেতমজুররে এম. ডব্লু হবু। ... বর্ধমান হাটগোবিন্দপুর কনফারেন্সে, সিথা কথা হল খেতমজুরদের আলাদা জোট হবু। তা বাদে হুগলী কন্‌ফারেন্স। খুব বিশ্বাস যে ছিল কালীবাবু, খেতমজুর কিষান হতে আলাদা লয়। আজ যি কিষান মহাজনরে জমি বান্‌ধা দিলে কাল সি খেতমজুর ... তারপর বর্ধমানে মেদিনীপুরে খেতমজুর পার্টি হলু, কিন্তু এখন দেখলু কিষণ সভা খেতমজুর দলরে ফেলে দিলু পাপ গর্ভের ছেলার মতো কুন— অ সময়ে মদন দিল নাই, তখন হতে নিজের কথা ভাবতে লাগলাম।'' [৩২]

বসাইয়ের নিজের কথা মানে খেতমজুর সমাজের কথা। খুব স্বাভাবিকভাবেই বসাই ওদের আপন জন হয়ে গেছে। পলতাকুড়িতে এসে বসাই টুডুর সম্মান দেখে কালী অবাক হয়ে গেছে। ছোট-বড় সবাই বসাইকে কমরেট বলে ডাকে। কারণ এই অনগ্রসর গ্রামগুলি বহু বছর পাশে পায় না এম. এল. এ বা এম. পি দের। পাশে পায় বসাইকে। খরায়-বানে-কলেরায় মড়কে-মহাজনের সঙ্গে লড়াইয়ে সঙ্গে থাকে বসাই, ওদের জন্য বসাই-এর অগাধ-অকৃত্রিম ভালোবাসা। বসাই তাই ওদের মধ্যমণি। ওদের স্বার্থেই বসাই পার্টি ছেড়েছে। কালী সাঁতরাকে বসাই জানিয়েছে—

> ''খেতমজুর আমু। ভেবে দেখলাম, চৌচালিশ বয়স হল— আমু খেতমজুরই রইলাম। অ্যানেক মিটিং করলাম, কনফারেন্সে গেলাম। কিন্তুক খেতমজুরের আসন দেখলাম না। ছত্তিশ সালে কিষান সভা হলু তখন হতে আজও বুঝলুম না, খেতমজুর হল্যে কিষানসভা মদত দিবে না কেনী? চৌষট সালে পার্টি ভাগ হল। ভাগ হক, যা হক, সঙে কম্‌নিস কমনিসের কিষান ফরণ্ট অবধি স্বীকার গেল না, খেতমজুরও কিষান শুনছি ... খেতমজুর আন্দোলন কিষান সভার আন্দোলন। ছোট কিষান কিষান সভার জান। আজ যি ছোট কিষান কাল সি মহাজনরে জমি দিয়ে খেতমজুর হয় ... কিন্তু খেতমজুরের হক কমনিস কিষান ফরণ্ট দেখলে নাই। কেনী কালীবাবু? কেনী? কম্‌নিস কিষান সভা যাদের লিলো তারা মধ্যম চাষী ... কমনিস দল যা বুঝে, ভোট— হাঁ ভোট। মধ্যম চাষী ভোট কণ্টোল করে লয়? ... তাতে আমু ভেব্যে লিছু, কমনিস হয়ে কাম করতে পারি, তুমাদের কমরেড বলতে পারি কিন্তু যখন আমি খেতমজুর, তখন তুমরাও মোক লাথ মারছ, ভুখা মানুষ লয়ে ই খেলা ভাল খেল নাই হে।'' [৩৩]

কালীও একথা সমর্থন করে মনে মনে কারণ তার অভিজ্ঞতাও ভীষণ ব্যর্থতা-বোধে তিক্ত। কালী সাঁতরা প্রৌঢ় রেজিমের লোক, কৃষক আন্দোলনে একদা বাইয়ের সহকর্মী 'জিলাবার্তা' নামক ধ্যাবড়া-ছাপা সাপ্তাহিকের সম্পাদক। কালী বুঝছে বসাইকে তার মতো দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। কারণ বসাই প্রাচীন বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। বসাই জানিয়েছে— 'আমু একটা লতুন পথ ভাবছু পথটো পুরানো বলেই লতুন। তাতে তুমরা যা ভাবুছ, তা লয়। লকসাল আমু হই নাই। বীরু পাঠক কেনী, যে মোর কাজে মদত দিবু, আমু তার সাথের সাথী।' বসাই কালীকে অবাক করে দেয়— 'বাঘ-সিঙ্গি ফেল করে যাচ্ছে, বসাই একটা পথ বের করেছে', বসাইয়ের পথকে কালীর সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু নকশাল নয়। কালী বুঝেছে বসাই এখন অপরিচিত মহাদেশ— 'সে মহাদেশ আক্রমণ কসপ্লোরেশন— কলোনাইজেশন সম্ভব নয়'। বসাই যেমন পার্টির সকল কর্মীকে অসৎ অকেজো জেনে ত্যাগ করছে তেমনি পার্টিও বসাইয়ের অবদান মনে রাখেনি। কালীর মনে হয়েছে বসাই সবাইকে ত্যাগ করলেও তাকে ত্যাগ করেনি এখানেই যেন কালীর সফলতা। ১৯৭৭এর জুলাইয়ে বন ভাঙতে

ভাঙতে এসব কথা কালী সাঁতরার মনে হয়। এতদিনের সংগ্রামী জীবনে তার ভেতরেও বসাইয়ের মতো কেবল জমা হয়েছে ব্যর্থতাবোধ, স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা কিন্তু বসাইয়ের মতো সে নিজের স্বতন্ত্র পথকে খুঁজে নিতে পারেনি। পার্টি-মতবাদ সংসারের মধ্যে পড়ে কেবল দ্বিধাবিভক্ত ও হতাশ হয়েছে।—

> ''কালী সাঁতরা বহুকাল আগেই পার্টির লোক এবং মফঃস্বল কেন্দ্রিক। কর্মক্ষেত্র তার স্বনির্বাচিত। ফলে শহরমুখী বাবুদের মত তার উন্নতি হয়নি। তার সততাতে কারো সংশয় নেই। রাজনীতি থেকে দুপয়সা না গোছাবার কারণে স্বীয় পুত্রের কাছেও সে বোকা বলে পরিচিত। কিন্তু মহল্লায় তার একটি ইমেজ আছে, পুরনো দিন থেকে পার্টির লোক। অথচ নিখরচায় চক্ষু অপারেশন ক্যাম্প না নড়লে ছানি কাটাতে পারে না। এমন লোককে ভোটের সময় কিংবা পার্টি ইমেজ নষ্ট হবার সময়ে গল্পের কুমিরের একটি ছানার মত তুলে দেখাতে কাজে লাগে। ... এখনো সে ধানকাটা হাঙ্গামায় গ্রামে যায়। কৃষককে কৃষিঋণ দিতে হবে বলে তদ্বির করে। 'জিলাবার্তা' প্রকাশ করে বহু জায়গায় বুক পোস্টে পাঠায়। এখনো সে স্কুল কমিটির মিটিঙে যায় ও শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানে জেলার হাকিমের পাশে বসে। কিন্তু ফুটো পাত্রে জল ভরার মত ব্যর্থতার অনুভূতি তাকে বিষণ্ণ করে আজকাল ... ইত্যাকার কারণে আজকাল বিপ্লব দিবসেও কালী সাঁতরার কলজে আবেগে নাচে না''

— কালী সাঁতরার পিতৃদত্ত জমি ছিল তিরিশ বিঘা। ১৯৪৩ সালে পার্টিতে যোগ দেবার সময় কালী সাঁতরা সে-জমি তার মাহিন্দারদের দিয়ে দেয়। কারণ কালীর বিশ্বাস ছিল বিপ্লব এসে যাচ্ছে, অচিরে কম্যুনিজম স্থাপিত হবে এবং তখন মানুষের থাকা খাওয়ার সমস্যা ঘুচে যাবে। কারণ ব্যক্তিগত মালিকানায় কমিউনিস্ট বিশ্বাস করে না। চল্লিশের দশকে কালীর একথা মনে হয়েছে আর সত্তর দশকে এসে মনে হয়েছে সবই বাতুলের প্রলাপ মাত্র। বেতুল কাওয়ার আর ময়েশ ঢালী কালীর দেওয়া জমি ধরে রাখতে পারে না, সে-জমি অচিরে মহাজনের জাবদা খাতায় ঢুকে যায়। 'মহাজনের জাবদা খাতাটি অজগর সদৃশ, গিলতে জানে, উগরোতে জানে না'। বর্তমানে কালী সাঁতরা স্ত্রী গিনিমালা আর ছেলের অর্থে জীবন ধারণ করে। কালী বোঝে বহুকাল যাবৎ গিনিমালা ও ছেলে তার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা লালন করেছিল, এখন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কালী এখন ওদের কাছে অবাঞ্ছিত বোঝা মাত্র। কালীর দিন কাটে 'জিলাবার্তা' নামক পত্রিকা সম্পাদনা আর পরের উপকার করে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন বসাইয়ের মতো কালীর 'কমনিস্ নাম বলতে লৌ জ্বলত'। বসাই কালীর সামনে তুলে ধরে বঞ্চনার চিত্র—

> ''তুমু আমু কারবার করথে আসি নাই, কিন্তুক সামন্ত? লক্ষ্মণবাবু? তারকবাবু? মোদের রেড কমরেড হাসান? কমনিস পার্টি জোতদারী কারবার করা যেছু সবাই? বাড়ি হল,

গাড়ি ভি সামন্তর হল, ছেলার চাকরি হলু, সভে বড় লীডার, কলকাতা চিনলু, গোছয়ে নিলু, 'কম্‌নিস' লাম ভাঙায়ে?"[৩৪]

অথচ এরকম হবার কথা ছিল না। 'কমনিস মানে কারো অন্নে দুধবাতাসা, কারো কপালে শাক ভাত নেই, তা নয়'। 'কমনিস' মানে ভালোবাসা, বামপন্থার রাজনীতিতে বসাই টুডুদেরকেও ভালোবাসার কথা ছিল। অথচ তা হল না, বামপন্থার রাজনীতিতে এরকম হওয়া উচিত ছিল না।

বসাইয়ের সমস্ত মনোভঙ্গের কারণ খেতমজুরদের উপর অবিচার, তার মনে আছে তেভাগা আন্দোলনের কথা, যেখানে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হয়েছে খেতমজুর।—

"তেভাগা ধান নিয়ে কথগান কথ সময়ে হয়াছে মনে আছু? ... ধান তো গান লয় কালীবাবু। আমারদের জাহান। চাষ পলুধান দেশ আমাদের লয়? বীজ ফেলবু, চারা লাড়বু, খেত নিড়াবু, ধান কাটবু, টাহালে উঠাবু অন্যেরা, তা মূল গায়েন কর্‌্যে যারা তারাদের দেখল নাই কুন— অ সভা? তে-ভা-গা-, বহুৎ বঢ়া আন্দোলন! জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, চব্বিশ পরগণা লালে লা-ল! কৃষকসভা ভাগচাষীরে মদত দিলু। ... খেতমজুর ভাগচাষী লয়। কিন্তুক যাই নাই খেতমজুর? মরে নাই গুলিতে? দুভাগের দাবি করাছিল ভাগচাষী, তা পায় নাই। কিন্তু কিছু বেড়েছিল ভাগ কালীবাবু? যা বাঢ়লু তার কিছু খেতমজুররে দিথে পারত নাই কিষানসভা? লাঃ! কিছু দিল নাই। ভাবল নাই খেতমজুরের কথা।" [৩৫]

স্বাধীনতার পরে কৃষকসভার চেহারার বদল ঘটল ভাগচাষী, বড় কিষান, মধ্যচাষী, সকলের স্বার্থ দেখল সভা। অবহেলিত হল ছোটচাষী, খেতমজুর। ১৯৫৩ সালে এম. ডবলু আইন হয়। কিষান সভা তা জানত কিন্তু সব জেলায় এম. ডবলুর দাবি তোলেনি। তখনও দার্জিলিং জলপাইগুড়ি জেলায় খেতমজুর পার্টি হয়নি। বসাই বলে— 'ই কিষান সভা পুলুস হতেও মন্দ কালীবাবু। কংগ্রেসের বাপ ইটা'। বসাইয়ের ক্ষোভ— 'কেন বাবুঘর ছাড়া লীডার আসে না? কম্‌নিস লিডারও বাবু কংগ্রেস লীডারও বাবু।' কালী সাঁতরার মতো দুচারজন ছাড়া আর সব পার্টিকর্মীই কোনও না কোনও সময়ে বসাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে সে সাঁওতাল, তার সমাজের মানুষ লেংটি পরে। অকালে ইঁদুর সাপ খায়, তার জাত আলাদা, সে বামুন-কায়েত খেতমজুর নয়, তার জমিও নেই। বসাই যখন বুঝেছে কিষান সভা গরীব কিষানের 'হক' দেখে না তখনই কিষান সভা ছাড়ার কথা ভাবে, আর তখনই বসাইকে জেলা সেক্রেটারি করার কথা ভাবা হয়,—

"আমু বসাই টুডু যখন পার্টি ছাড়বু বল্যে বুঝলু তখন তারে জিলা সেক্রেটারি করথে চাহালু, তার আগে ভাব নাই। কিসের জিলা সেক্রেটারি। খেতমজুর ইউনিয়নের, কি কুন ইউনিয়ন? আটষট সালে পাঞ্জাবে মোগা কনফারেন্সে যি ইউনিয়ন হলু তার মদতদার কে? সিপিআই। দিল্লী হথে আনলু গাই-পিছু বাছুর সিপিআই। ই ইউনিয়নের জিলা সেক্রেটারি বসাই কেনী? তাথে পার্টির জোর বাড়ে। ই ইউনিয়নের মদত দিথে কেউ

নাই, নড়বড়া ইউনিয়ন, সবাই ই ইউনিয়ন হাথ কর কেনী? কিষান সভায় জিলা সেক্রেটারি করার সময়ে বসাইয়ের কথা ভাব নাই কেও।" [৩৬]

এই সকল অন্তরালের সত্য বসাইয়ের কাছে এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে তাই সে দল ছাড়ছে, অথচ বামপন্থার রাজনীতিতে এরকম হওয়ার কথা ছিল না। কালী সাঁতরা জানে কিষান সভাও কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতের মাটিতে সে-পার্টি মইয়ের নিয়মে চলে। তাই যখন গুলি খায় সাধারণ কর্মী নাম হয় জেলের নিরাপত্তায় থাকা প্রথম শ্রেণিতে বন্দী লীডারের। বসাই কিষান সভা ছেড়েছে একবছর, তার আগে পার্টিও সামন্তদের জন্যও করেছে অনেক কিছু। সাইকেল বিক্রি করে পার্টিফাণ্ডে টাকা এনে দিয়েছে কারণ সামন্ত বম্বে যাবে। সেই সাইকেলটি দশখানা গ্রামের খেতমজুর ও ছোট চাষীরা টাকা তুলে বসাইকে কিনে দিয়েছিল। তবুও পার্টির কাছে সামন্তর অনেক মূল্য, বসাই বা কালীর নয়। তাদের শরীর ক্ষয় কিছু নয়, তাদের সর্বস্ব দান কিছু নয়, ত্যাগ ত্যাগ নয়। কমরেড বসাই টুডু দল ছেড়েছে আর তার বক্তব্য শোনা বোঝার জন্য পার্টি কালীকে পাঠিয়েছে বসাইয়ের কাছে, সামন্তর নির্দেশে। 'কমরেড বসাইয়ের কাছে যদি যাও, বসাই নকশাল হয়ে গেছে বলে নিজে বলুক'। কালীর মনে হয়েছে পার্টি যেন আদালত, পার্টি যেন মানুষ নিয়ে গঠিত নয়। কালী বুঝেছে বসাই নকশাল হয়নি। সে নকশাল নয়, নিজের 'সাঁনতালী' বুদ্ধিতে সে অন্য এক সংগ্রাম পদ্ধতি তৈরি করেছে। বসাই নকশাল নয়, কিন্তু ওদের সমর্থন করে। কারণ— 'ওরা জানে মরথে। এমুন কর্য্যে মরথে আমু কারেও দিখি নাই। তুমু বুঝবে নাই তুমরা জানু গায়ে ছড় না লাগায়্যে আন্দোলন করথে, উরা তা জান্যে নাই'। কালী সাঁতরা মনে করে নকশালের পথ ভুল পথ। বসাই ভাবে অন্যভাবে—

'তুমু যা চিনু, তুমু যা জানু তাই পথ হথ্যে হব্যে'। 'আমু সানথাল কেমন্যে জানবু কে ঠিক কর্য্যে, কে ভুল কর্য্যে। তোমাদের সাভিয়েটের পথ ঠিক, উরাদের চীনী পথ ভুল, ই কচকচি আমু বুঝি না।' 'লকসাল মোক মদত দেয় মদত ল্যিবু' তবে 'লকসালীদের ভুল আমু করব নাই। যার তরে লড়াই, তারে বুঝাব না— তারে মরথে শিখাব না— পুলুস গ্রামে পশলে সকল ঘর জ্বালাবু সবারে মারবু— জোতদার মেরে পুলুস লাগিয়ে গ্রাম লাহাশ করবু— উথে বসাই লাই'। [৩৭]

আবার নকশাল বাবুদের বলে 'পাইপগান করবু? গুলি ছুটাবু? কেনে? কুচ ফল নাই? আমু তীরের চেঁটা বিষে জরাবু, উয়াদির তালিম দিবু। বাবু শিক্ষায় সান্তাল মুতে দেয়'।

বসাইয়ের ক্ষতস্থানে হাত পড়লে বসাই ভয়ঙ্কর, তখন সে দুহাতে বাতাসের গলা মোচড়ায়, চোখ লাল হয়ে যায়। এটি বসাইয়ের মুদ্রাদোষ, বলা যায় এটি তার প্রতিবাদের আর একটি ধরন। জোতদারের ধান কেটে খেতমজুর মিনিমাম ওয়েজ পায় না, ওয়েজ চাইলে জোতদার সরকারি সহায়তায় দাওয়াল এনে ধান কাটে। ১৯৫৩ সালে এম. ডবলু হয়েছে। ঊনষাটে রিভিশন।

আটষট্টির রিভিশন ১৯৭৭ সালেও চালু আছে।— 'মরদ তিনটাকা চুয়ান্ন-বিটি তিন টাকা সাতাশ— টোকাটুকি ২ টাকা দু পয়সা, হাথে কি মিল্যে। আটআনা— দশ আনা— এক টাকা— আশি পয়সা— তা দিবার কাল্যেও লুকনা খাতা বেরায়'। সাঁয়ত্রিশ লাখের বেশি খেতমজুর সরকারের ঘোষিত রেট পায় না। প্রশাসন জোতদারের কথা ভাবে। জমি জোতদারের। জোতদাররা সেচের জন্য খাল থেকে জল নেয় না। কারণ ভাগচাষী বা আধিয়ার বেশি ধান ফলিয়ে বেশি ধান পাক তাতে জোতদারদের স্বার্থ 'চোট খায়'। কম ধান হলে ভাগচাষী, খেতমজুর সবাই ফাঁপরে পড়ে মহাজনের কাছে যাবে। জোতদার যে মহাজনও সে। মানুষ তাদের কাছে টাকা ধার নেয়, ধান কর্জ নেয়। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়ে, আদিবাসী খেতমজুরদের অবস্থা আরও খারাপ। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার কমিটি কাজ করছে। দু-চারটি সাঁওতাল আদিবাসীর নাম প্রশাসনে আছে, এরা আসলে 'শিক্ষিত পাশ করা সানতাল ওরাও সবাই মিশনারীদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবদান। কুমিরের ছানার মতো এদের দেখানো চলে তুলে তুলে। যাদের দেখানো চলে না, তাদের অবস্থা 'চৌদ্দ সানকির তলায়'— আস্তে আস্তে তাই বঞ্চনার লোহা-গরম হয়। খরা, অকাল, বান বছর বছর, খাবার জল নেই। সরকারি ত্রাণও পৌঁছায় না ওদের হাতে। উচ্চবর্ণ ছাড়া সকল নিম্নবর্ণ দিনান্তে অন্ন, মাথার ওপর পাতার ছাউনি পায় না। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-ওড়িশায় আমানি বিক্রি হয়। ভাতের হোটেলের কাঁচা নর্দমা থেকে ফেন নেয় মানুষ। অথচ গরীব কৃষকেরাই সমগ্র কৃষক সমাজের বারোআনা অংশ এবং তারাই সমগ্র ভূমিবিপ্লবের প্রধান শক্তি। অথচ ভারতের এই গরীব মানুষেরা ক্রমশ রিসার্চের বিষয় হয়ে যাচ্ছে। এইসব আদিবাসী কৃষকদের কমিউনিস্ট নামের কাছে প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু কমিউনিজমে চিন্তাধারার সঙ্গে প্রয়োগের বিরোধ ছিল। আদিবাসীদের বক্তব্য ফ্রন্ট তাদের কথা ভাবেনি, নকশাল যখন তাদের মদত দিচ্ছে তারা মদত নেবে। যে দেবে সে-ই তাদের বন্ধু। এই পাহাড় প্রমাণ বঞ্চনাই বসাইয়ের ক্ষোভের কারণ— 'নকশাল আমু হয় নাই। কমরেট যে চোট দিছু তাথে আর শিক্ষিৎ বাবুর শিখানা পথে কানার মত যাব নাই'। বঞ্চনার আগুনে গরম হয় লোহা— রেজাল্ট বসাই টুডু।—

> ''এই যন্ত্রণা ও অবিচারই বসাইয়ের মহাবিশ্ব। চীনের পথ ও চেয়ারম্যান তার পথ তার চেয়ারম্যান নয়। বাইরের আইডিয়া বুঝে সে যা শিখেছিল তা সে বর্জন করতে চায়। নকশালদের মদতে তার কাজ হলে সে মদত নেবে। কিন্তু তার নিজস্ব সংগ্রাম যতদূর বলবে ততদূর নেবে তার বেশি নয় ... সামন্ত বলবে বসাই নকশাল। সম্ভবত বীরু পাঠকও দাবি করবে বসাই নকশাল।'' [৩৮]

কালী বোঝে বসাইয়ের বক্তব্য না শোনার, না বোঝার ফলেই বসাইকে হারাতে হয়। কালীর মনে হয় জীবনের প্রতি স্ট্রেট থেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাকে কাজে লাগাতে পেরেছে বসাই। নকশাল হবে বলে সে পার্টি ছাড়েনি, পার্টি ছেড়েও সে নকশাল হয়নি। পার্টিতে খেতমজুরের দাবিকে অনবরত উপেক্ষিত হতে দেখে পার্টি ছেড়েছে সে।

১৯৭০-৭৬ সাল অবধি চারবার বসাই টুডু সম্মুখ সংঘর্ষে নিহত। চারবারই মৃত্যুর পর আবার কোনা না কোনো 'অ্যাকশন অপারেশন'এ বসাই টুডু সদর্পে আত্মপ্রকাশ করেছে। বসাই টুডুর বয়স একান্ন, উচ্চতা পাঁচ-সাত, রং কালো, কপালে কাটা দাগ। আর তার ফেভারিট মুদ্রাদোষটি বড় ভয়ানক। রাগলে সে হাত দিয়ে বাতাসের গলা মোচড়ায়— এই চিহ্ন ধরেই প্রতিবার বসাইয়ের লাশ শনাক্ত করা হয়েছে। প্রতিবারই, কালী সাঁতরাকে উপস্থিত করা হয়েছে, আর কালী সাঁতরা লাশ দেখে বসাইকে শনাক্ত করেছে। এহেন বসাই টুডুর প্রথম মৃত্যু হয় বানারিতে। বাসাইয়ের প্রথম অ্যাকশন— 'অপারেশন বানারি'। ১৯৭০ সালের বৈশাখ । কালী সাঁতরা বসাইয়ের সঙ্গে দেখা করে চলে আসার পর। বানারি গ্রামে বসবাস করে কিছু সাঁওতাল, ক্যাওট ও চামার। এরা পেশায় খেতমজুর। সাঁওতালরা অবশ্য দাওয়ালী বা নামালী কাজ করে। দাওয়ালদের এম. ডবলু বা মিনিমাম ওয়েজ দেওয়া হয় না। তারা জানে আইন করা হয় বলবৎ করা হয় না, আর যাদের জন্য সে-আইন, তারা জীবনেও তার বেনিফিট পায় না, তাই— 'সকল নিরন্ন নেংটের মতো এরাও সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত নয়। ক্ষুধা দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, ক্ষুধা বড় অত্যাচারী শাসক। তাই সাঁওতালরা এম. ডবলুর আশা না করে জমি মালিকের সঙ্গে ফুরানে আউশ-আমন, ছোলা-অড়হর, সরষে, পাটের চাষ করে। তবে যেখানে খেতমজুরদের ওয়েজ দেবে না বলে জমিমালিকরা তাদের ডাকে সেখানে বানারি গ্রামের সাঁওতালরা যায় না। এই বানারি গ্রামের 'হর্তাকর্তাবিধাতা' হল প্রতাপ গোলদার। বানারিতে তার বাড়ি। হাজার বিঘা জমির মালিক। তার বাড়িতে ডায়নামো, দিঘি, পাকা ইঁদারা সবই সরকারি রিলিফের টাকায় অথচ গ্রামের নিরন্ন মানুষগুলি জলের খোঁজে বালি আঁচড়ায় দেড় মাইল দূরের চরসা নদীতে। দুর্গত কৃষকদের সহায়তায় প্রদত্ত শস্যবীজ ও খাদ্যশস্য, জনতা শাড়ি, ধুতি, ওষুধ সবই প্রতাপের বাড়িতে জমা হয়। বন্যার বছরে দুঃস্থদের গৃহনির্মাণে প্রদত্ত টাকায় প্রতাপের ধান চালের গুদাম ঘর তৈরি হয়। হেল্‌থ সেণ্টারের টাকায় প্রতাপের ধানচালের লরি যাতায়াতের পাকা রাস্তা। ২৫টি গ্রামের মহাজন প্রতাপ। খেতমজুরদের মজুরি দেয় নিজের নিয়মে—

> ''বড়রা পায় সাঁইত্রিশ পয়সা, কিন্তু জলপানি— মুড়ি ও পিঁয়াজ পেলে জলখাই খরচা কেটে হাতে পায় পঁচিশ পয়সা, ছোটরা পায় ত্রিশ পয়সা। জলখাই-খরচ বাদ দিলে আঠারো পয়সা ... টাকা দেবার সময়ে প্রতাপের খাতায় টিপ ছাপ দিতে হয়। সম্বছরের ধান ও টাকা নেবার সময়েও খাতায় টিপ দিতে হয়।'' [৩৯]

এরা তাই কোন মতেই প্রতাপের বিরাগভাজন হতে পারে না। দশ শতাংশ খেতমজুর জানে না ভারতবর্ষ স্বাধীন, খেতমজুরের ন্যুনতম মজুরির কথা তারা কখনও শোনেনি। তারা জানে আগে যাদের ইংরেজ বলা হত এখন তাদের বলা হয় ভারত সরকার। কিন্তু বীরু পাঠকের দলের সান্নিধ্য তাদের অজ্ঞতা দূর করছে। বানারি গ্রামের মাধবতুরা আর গোপী মাঝি ওরা বীরু পাঠকের দলের।

১৯৬৮ সাল থেকে ওরা প্রতাপের সঙ্গে লড়ছে খেতমজুরের প্রাপ্য আদায়ের জন্য। এই সময় কিছু জোতদার নকশালদের হাতে প্রাণ হারায়। মাধব, গোপী বানারির মানুষকে বোঝায় এই সময়ই প্রতাপকে দিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে। কিন্তু ওরা ভয় পায়, ওদের ভরসা কেবল বসাই টুডুর ওপর। 'প্রতাপের বলবু কুন তাগদে? মোরাদের সাথ কি বসাই টুডু আছে?' বসাই ওদের কথা শোনে এবং বোঝায় দরকার হলে প্রতাপকে মারতে হবে। খেতমজুর আটঘট্টির রেট চায় প্রতাপের কাছে। প্রতাপ রাজি হয় না। চরসা তীরে বসাই আর খেতমজুররা মিলিত হয়। প্রতাপকে ডাকে এই কয়দিনের মজুরি তারা এখনি চায়, নাহলে সরকারি বীজধান তারা নদীতে ফেলে দেবে। নকশালি হাঙ্গামার সুযোগে প্রতাপকে হত্যা করা হয়। গানপয়েন্টে প্রতাপের সিন্দুক খুলিয়ে নশো তেত্রিশ টাকা আর প্রতাপের খাতা নিয়ে নেয় বসাই। তার লাশ পাচার করা হয়, বসাই সব ঝামেলা নিজের ঘাড়েই নেয়, গ্রামের লোককে বিপদে ফেলতে চায় না সে। প্রতাপের লাশ পাচার করতে গিয়েই পুলিসের দ্বারা বসাই আক্রান্ত হয়।— প্রতাপ-মাহিন্দরের লাস পাচার করার পর ভোমরা নামের মহিষটিকে যথাস্থানে পৌঁছাতে গিয়ে বসাই জলে নামে। 'অকস্মাৎ পুলিশের গুলি। ক্রমে আলো ফোটে ও একটি মাদী মোষ, একটি মানুষকে জলে ভেসে চলতে দেখা যায় ... মানুষটির মুখ থেতলে যায় ... লাশটি দেখে লবন মাঝি চেঁচিয়ে ওঠে ... ই সি বসাই টুডু লয়'। বেনামি লাশের নাম পাওয়া যায়। 'জিলাবার্তা' অফিস থেকে কালী সাঁতরাকে উড়িয়ে আনা হয় প্রায়। কালী শুকনো গলায় বলে 'বসাই, বসাই টুডু' কারণ তার মুদ্রাদোষটি মিলে গেছে। এটা বসাইয়ের প্রথম মৃত্যু।

বহুদিন বাদে আবার 'রাঢ় যখন আর্মি মার্চে প্রত্যহ ধর্ষিত, তখন একদিন জাগুলার উপকণ্ঠে হইহই করে শোনা যায় 'বসাই টুডু ইজ ইন অ্যাকশন'। এতদিন বসাই গুলি খাবার পর দিশাই গ্রামের মাঝিপাড়ায় নিরাপদেই ছিল। বসাইয়ের দ্বিতীয় অ্যাকশনে প্রশাসনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ১৯৭২ সাল। তেরো মাস আগে বরানগর গণহত্যা ঘটে গেছে। আটঘট্টির এম. ডব্লু তখনো রিপোর্টে আর রেকর্ডে চালু। ১৯৭২ সালের বসাইয়ের অ্যাকশন— 'অপারেশন জাগুলা'। ঘটনাটা ঘটে জাগুলা সদর থেকে ছয় মাইল দূরে কাঁকড়াশাল গ্রামে। এখানকার জোতদার রামেশ্বর ভুঁইঞা পনেরো হাজার বিঘা জমির মালিক, বেনামিতে। আবার সে লোকাল কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তার বাড়িটি গড়সদৃশ, জাগুলায় তার বাজার আছে, কাঁকড়াশালে আছে ধানকল। সে নীচু জাতের গ্রামের খেতমজুরদের তাড়িয়ে সস্তায় দাওয়াল এনে ধান কাটায়। সত্তর দশকে এই গ্রাম ছাড়া দাওয়ালদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছিল কারণ নকশালি হাঙ্গামায় বেশিরভাগ গ্রামবাসী ছিল গৃহহারা। তাই জেলায় ভাসমান এক সুবিপুল জনসংখ্যা ফুরানে যে কোনও রেটে ধান কাটত। একজন জোতদারের মুণ্ড খোয়া গেলে প্রশাসন তার বদলে গড়ে একশো মুণ্ডু ফেলে বদলা নিয়েছে। ফলে মানুষগুলি অসহায়। রামেশ্বর ভুঁইয়া গ্রামের খেতমজুর ছেড়ে দাওয়াল নেয়, রেট— 'বড়দের তিরিশ পয়সা, ছোটদের বিশ পয়সা'। গ্রামের মজুর না

নেওয়ায় খেতমজুরদের মধ্যে জমতে থাকে ক্ষোভ। তারাও এখন নকশালি মদত পাচ্ছে। খেতমজুর তখন সংগ্রামশীল দল গড়েছে। নকশালি লিডার বীরু পাঠক পুলিসের হাতে নিহত। খেতমজুরদের মধ্যে নকশালি মদতে কিছু মেরুদণ্ডী জন্মাচ্ছে। ১৯৭২ সালে রামেশ্বর বলে সে এবার এ অঞ্চলের মজুর নেবে না, দাওয়াল আনবে বাইরে থেকে। এই ব্যাপার নিয়েই রামেশ্বরের সঙ্গে বাধে বসাইয়ের দলের খেতমজুরদের। কংগ্রেসের মদত পায় রামেশ্বর। বসাইয়ের দল রামেশ্বরকে বলে— 'আটষটের মজুরি দাওয়ালদের দিতে হবেক খেতমজুরদের ভি'। লড়ায় বাধে দুই দলের—'শত শত সাঁওতাল তীর ধনুক, হেঁসো, টাঙি টেঁটা কোঁচ বর্শা, বল্লম ইত্যাদি আদিম অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ... দশ দিনের কাজ হেথা, দশ দিনের মজুরি না দিলে কেউ কাস্তে উঠাবু না, কারেও ধান কাটতে দিব্য না'। এরপর পুলিসের আগমন, লাঠি, গুলি চার্জ—

> ''বসাই চেঁচিয়ে ওঠে মা-হো ... তার যুদ্ধের ডাক 'মাহো'তে ভীষণ কারেন্ট। চমকে রামেশ্বর লাফিয়ে ওঠে। গলনালীতে বসাইয়ের টেটা খায়। পলায়নপর সাঁওতালদের ওপর গুলি। ধানখেত হতে তীর। ধানখেতে আগুন। ... এস. আই চেঁচিয়ে ওঠে ও হেঁসোর আঘাতে ঢলে পড়ে ... বসাইয়ের পায়ে গুলি। বসাইয়ের পেটে বেয়নেট। সঙিনের ফলা মুখে। ... বসাই ঢলে পড়ে।'' [৪০]

সঙিনের খোঁচায় ছিন্নভিন্ন বসাই আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। কালী সাঁতরাকে ডাকা হয়। মারা যাবার আগে বসাই বাতাসের গলা মোচড়ায়। পরের দিন বডি আইডেন্টিফিকেশন। বাস বোঝাই সাঁওতাল আসে। সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা অবধি দুইশত একান্ন জন লোক বসাই টুডুর শবদেহ শনাক্ত করে, মৃতদেহ সৎকার করা হয়। বসাইয়ের কথা ভাবতে গেলেই বুকের কষ্ট বাড়ে কালী সাঁতরার। 'জিলাবার্তা' কাগজে মন বসে না। প্রত্যহ একটু একটু করে মরে যেতে থাকে, মৃতপ্রায় হয়ে বেঁচে থাকে। এই সময় পার্টির ছেলেদের ব্যাপক গ্রেপ্তার শুরু হয়। কালী সাঁতরা চায় তাকেও গ্রেপ্তার করা হোক কিন্তু তা হয় না। প্রজাতন্ত্র দিবসে সে হাকিমের পাশে বসারই আমন্ত্রণ পায় এবং হাকিম বলেন—'আপনি আমাদেরই লোক।' যা কালী হতে চায়নি কোনদিনও।

১৯৭৩ সালে বসাই আবার অ্যাকশন করেছে। এবার 'অপারেশন বাকুলি'। বাকুলিতে এবারকার ইস্যু জল। এখানকার জোতদার সূর্য সাউ। দেড় হাজার বিঘা জমি তাছাড়া আছে কেরোসিন-কন্ট্রোলের দোকান, বাসসার্ভিস, কারখানা। যদিও তখন নকশালি আগুন প্রশমিত কিন্তু সে-সময় সূর্য সাউয়ের কিছু ক্ষতি হওয়ার কারণে সরকারি লোন পায় সে। দুঃস্থরা দুঃস্থ থাকে। বাকুলি বসাই-উপদ্রুত এলাকা ছিল। কারণ সরকারি রিলিফের টাকা সূর্য সাউ নিজে দান করত। গরীব মানুষ বঞ্চিত হত। সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন আকাশ জ্বলছিল, মাটি ফাটছিল সূর্য সাউ ওদের জব্দ করতে কানাল থেকে জল নিয়ে চাষ বাড়াতে রাজি হল না। কারণ বসাই একসময়

এ অঞ্চলের সাঁওতাল ও নিচুজাতের ক্ষেতমজুরদের মধ্যে ভাগচাষী বা অধিয়ারদের ভাগ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে, লড়াই করেছে। এ কারণে সূর্য সাউ বলে, 'কানাল হতে জল লয়্যে চাষ যথ বারাবু, উ তথো ভাগ ল্যিবে'। তার চেয়ে ওরা ধার নিলে তার লাভ সুদের টাকা। তবে ঋণমুকুব প্রহসনের কথাও সূর্য সাউয়ের জানা। তাই খরা অজন্মা-দুর্ভিক্ষের সময়ে সূর্য সাউ উল্লসিত হয়। যে-খাতা দেখিয়ে সে ঋণ দেয় সে-খাতা কোনদিন সরকারের আদালতে যাবে না কারণ কোনও আধিয়ার মহাজনের নামে নালিশ করতে পারবে না। এক সন্ধ্যায় তাই ভাগচাষীরা দলবদ্ধ হয়ে সূর্য সাউয়ের বাড়ি আক্রমণ করে। একজন বসাই টুডু বলে নিজের পরিচয় দেয়, সূর্য সাউ নামতে রাজি হয় না কিন্তু দলে দ্রৌপদি আছে যে বসাইয়ের লাশকে শনাক্ত করেছে তবে এখন অস্বীকার করে, বলে— 'তুউর পুরাতন নাগর! তুরে দেখবে বল্যে নতুন হয়্যে এসাছে'। ১৯৭৩ সালে আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়।— ওরা সূর্য সাউকে ধরে গরু খুলে গাড়িতে বেঁধে নিয়ে যায় কানালের ধারে টেনে। 'বলির পশুর মতো ফেলে ও বসাই কোপ মারে। তারপর বহু হাতে বহু কোপ। এরপর ভারতের গর্বস্থল জওয়ানরা ক্যাপটেন অর্জুন সিংহের নেতৃত্বে বাকুলি ঘিরে ফেলে। যেহেতু জল নিয়ে বিবাদ তাই জলের পথ প্রথমেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর বসাইয়ের দল আর জওয়ানদের মধ্যে তীর ধনুক আর গুলির লড়াই শুরু হয়। নারী-পুরুষ-শিশুসহ সমগ্র দলটির ওপর মেশিনগান চালানো হয়। দেড়দিন ফায়ারিং চলার পর পুলিশ ঢুকে পড়ে জঙ্গলে। একচল্লিশটি লাশ পাওয়া যায়। জনাদশেক বালক বালিকা। লাশ সরানোর সময় একটি লাশ অ-লাশোচিত আচরণ করে, পুলিশকে আক্রমণ করে,— 'এবং লাশটি উঠে বসে দুহাতে নিরন্তর বাতাসের গলা মোচড়ায় ও বলে 'আমু বসাই টুডু। কে আসবি আয়? লঢ়'। তারপর তাকে গুলিতে ঝাঁঝরা করা হয়। সকলেই সম্মুখ সংঘর্ষে মারা পড়ে। দ্রৌপদীও তার স্বামী দুলনা পলাতক। এস. পি ধরে আনে কালীকে। বসাইকে শনাক্ত করা হয় তার মুদ্রাদোষ— মৃত্যুকালে বাতাসের গলা মোচড়ানোর চিহ্ন দেখে।

প্রথম দুটি অ্যাকশনের সমস্ত দায়িত্ব বসাই নিজের উপর নিয়েছে। এটিই তার পথ, তার আক্রমনের ধরন। সাঁওতাল ও গরীব ক্ষেতমজুরদের বিপদ থেকে পুলিশি হাঙ্গামা থেকে বাঁচিয়েছে সে। প্রতাপ হত্যা, রামেশ্বর হত্যার প্ল্যান, ক্ষেতে আগুন ধরানো তাই বসাইয়ের নামে বর্তায়। ক্রমশ বসাই অ্যাকশনের নাম হয়ে যায়, প্রতিবাদের নাম হয়ে যায়, এক একজন প্রতিবাদী বসাই হয়ে যায়। এবারের সবাইকেও কালী চিনতে পারে। এ মুসাই 'মুসাইয়ের প্রেমময়ী মোঝেন। গিধা ও সিধা, দুই ন্যাংটো ছেলে ও অসুমার দারিদ্র ছিল। মুসাই বসাই হতে গেল সব ছেড়ে? ভীরু ডরপোক মানুষ বসাইয়ের অনুগত।' কালী সাঁতরা শনাক্ত করে বসাই টুডুর লাশ। কালী সাঁতরা পাল্টে যায়, রাগ হয় ওর। এখন বসাই অ্যাকশন করছে শুনলে কালী স্বস্তি পায়। বসাইয়ের তৃতীয় মৃত্যুতে 'এনকাউণ্টার' নামক শব্দটির মানে কালীর ভেতরে ঢুকে যায়। ওর সমগ্র সত্তায় ইনজেকটেড হয় পুলিস ও আর্মির বিপ্লবী নির্যাতন বিষয়ে ঘৃণা'। তবুও কালীকে গুপ্ত

নকশাল বা সুপ্ত নকশাল-দরদী বলে প্রমাণ করতে পারে না প্রশাসন। কিন্তু কালী চায় তার বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নেওয়া হোক। বসাইয়ের মতো সেও সক্রিয় কর্মীর মর্যাদা পেতে চায়। সেও কিছু নাড়া দিতে চায় এই বদ্ধমূল দৃঢ় সমাজ-ব্যবস্থাকে, বসাইয়েরই মতো। ১৯৭৪ সাল চলে যায়, ১৯৭৫ সাল আসে, প্রেস গ্যাগড হয়, আবার এমার্জেন্সির শ্বাসরুদ্ধ পঁচাত্তর সালও কেটে যায়। কালী বসাই হয়ে বসাই-এর ক্রোধ, বসাইদের বঞ্চনা, তাদের যন্ত্রণাকে বুঝতে চায়, বসাই হয়ে যেতে চায় মনে মনে। পারে না। তবে কালী এটাও বোঝে যে বসাই যে-পথে গেছে সে-পথে মুক্তি আসবে না তবু কেন যে বসাই বারবার মরছে ও দাহ হচ্ছে। আসে ১৯৭৬ সাল। ১৯৭৪ সালেই পুনরায় খেতমজুরের মজুরি সংশোধিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র একই রেট চালু হয়। ৭৬ সালে আর এম. ডব্লু কাগজে কলমে বদ্ধ থাকে না, কার্যকরী করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলায় ৩৭ লক্ষ খেতমজুর যাতে যথার্থ মজুরি পায় এ উদ্দেশ্যে ষোলজন ইনস্‌পেকটর নিয়োগ করা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় খেতমজুররা যথারীতি আট-আনা, একটাকা-দুটাকা মজুরি পায়। এইসব মজুরির নোটিফিকেশনের বর্ণনায় উপন্যাস হয়ে যায় রিপোর্টাজ। কালী তার সকল সততা নিয়ে সকলের কাছে অবোধ্য হয়ে যায়। আবার কালী সাঁতরার ডাক পরে 'বসাই টুডু বেঁচে আছে একবার চলুন একটু হেল্‌প করুন', এস. আই জানায়। এর আগে খেতমজুরি লড়াইয়ে বসাই তিনবার মরেছে। এবারের ঘটনা কদমখুঞা গ্রামের। বসাই মারা যাচ্ছে। গ্যাংগ্রীন সেট ইন করে, বনডেড লেবারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে। ঝামেলা লেগেছিল এম. এল. এর বাবার সঙ্গে, যে এ তল্লাটের মস্ত বড় মহাজন জগত্তারণ। বসাই মারা যাচ্ছে, কালী সাঁতরাকে নিয়ে আসে পুলিস। কালী দেখে—

> ''বীভৎস ফোলা বাঁ পা অস্বাভাবিক কোন সৃষ্টি করে ছড়ানো। পুলিস ঘিরে ফেলে যুবক শরীর। জোড়া ভুরু। বসাইকে দ্বিতীয় শনাক্তকরণে দ্রৌপদীর হাতে হাত ছিল। ... বসাই টুডু চোখ তোলো। তরুণ কণ্ঠে মৃত্যুর কফফ্। বলে 'আমু মর‍্যে লাহাশ হয়্যে যেছু। তাথেই শনাক্ত করথে আলছু কমরেট? বলেই সে ভীষণ আক্রোশে বাতাসের গলা মোচড়ায়, পিষে ফেলে। তারপর নিকটতম পুলিশকে টিপ করে থুথু ছোঁড়ে। ... গ্যাংগ্রীন তলপেটে সংক্রমিত হয়। মৃত্যু অবধি বসাই আর একবারও মুখ খোলে না ও জগত্তারণ বেঠ-বেগারদের ছেড়ে দিয়েছে জেনে মুখ ফেরায়। মারা যায় আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডে, দ্রৌপদী থাকে না নিখোঁজ।'' [৪১]

চতুর্থবার বসাই মারা যায়। এবার বসাই হয়ে মারা যায় দুলনা, দ্রৌপদীর স্বামী আর দ্রৌপদী ফেরার। আসে ১৯৭৬ সালের ধানকাটার সময়। রামেশ্বর আর পিয়াশোল গ্রামের জোতদার হরিধন সর্দার এম. ডব্ল্যুর এগেনেস্টে ল্যইয়ার লাগায়। যেখানে যেখানে খেতমজুররা লড়েছে বা তাদের ইউনিয়ন লড়ছে সেখানে জোতদাররা কেস ফ্রেম করছে খেতমজুর ও ইউনিয়নের

কর্মীদের ফাঁসিয়েছে ফৌজদারি কেসে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর শেষে সাতাত্তর সাল আসে, আবার বিধানসভা হয়। 'পশ্চিমবঙ্গে নো পোসট ইলেকসন জুবিলেশন।' সামন্ত গোরা, নকুল সব বন্দীরাই মুক্তি পায়।— 'সামন্ত জাগুলার হিরো রামেশ্বর ভুঁঞার গাড়ি করে স্টেশন থেকে বাড়ি আসে ও তারই জীপে ইলেকসন ক্যাম্পেন করে।' কালী, সামন্ত ও রামেশ্বর একই দলভুক্ত। কালী পরিবর্তনপন্থী হতে পারে না তাই সে আগের সুরেই কথা বলে। সামন্তকে বলে— 'এখন তো আমাদের গভর্মেণ্ট ... এই সরকার কি পারে না সেই ভুল ওয়ার্ডিং কারেকট করে ইনজাংশন রিমুভ করতে? এম. ডব্ল্যু বাধ্যতামূলক, না সাবজেকট টু সিভিয়ার পেনালটি করতে'। সামন্ত বলে সম্ভব নয়। কারণ এই সরকারও সাঁইত্রিশ হাজার খেতমজুরের চেয়ে কয়েক হাজার জোতদারদের স্বার্থই বড় করে দেখে। কালী বোঝে যে পার্টি ব্যানারই থাক, খেতমজুর সেই খেতমজুরই থাকবে। লড়াই করবে আর মরবে। এই সময় কালীর মনে হয়েছে বিপ্লব ও সমাজবাদ 'বড্ড বড় কথা'। যেখানে জাতিভেদ ও ছুত-অছুতের মতন মৌল সমস্যার সমাধান হয়নি। কালীর মনে হয়েছে বিপ্লব ও সমাজবাদ ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, ডেকে আনলেই হয় একথা এতদিন সে একলাই বিশ্বাস করেছে, কোনও পরিবর্তনই হয়নি।

১৯৭৭ সালে বসাইয়ের প্রথম মৃত্যুর সংবাদ মাতো ডোম, একজন সময়ের রংরুট, থানায় পৌঁছে দেয়। এই সাতাত্তরেই কালীর একক যাত্রা বসাইয়ের উদ্দেশ্যে গোপনে, বেতুলকে সঙ্গে নিয়ে, যখন চরসার গভীর জঙ্গল ভেঙে পৌঁছেছে কালী সেই গুহায় যেখানে সদ্য কবর দেওয়া হয়ে গেছে পঞ্চম বসাইকে। আর ষষ্ঠ বসাই বিপ্লবের-বিদ্রোহের-আত্মবলিদানের মন্ত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। সেই সময় কালী পৌঁছে যায়, মুখোমুখি হয় সাঁওতাল রমণী, বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি দ্রৌপদীর—

> ''দ্রৌপদী ও কালী সাঁতরা পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে এবার বসাই পালিয়ে গেছে পিয়াসে। গেছে, হরিধন সর্দারের ব্যবস্থা করে তবে গেছে, কালীর হঠাৎ মনে হয় ওর বয়স একষট্টি ... ভীষণ ক্লান্তি। আবার ফিরতে হবে। আবার বসাইকে শনাক্ত করতে হবে, এবার শরীরটা ঠিক করে ফেলতে হবে ... আস্তে আস্তে সে জটাজালে তৈরি স্বভাব গুহায় ঢোকে। কাঁচা মাটির গোর। ... পঞ্চম মৃত্যুতে বসাই মৃত ও সমাহিত রাতে। একই রাতে বসাই ডেন ছেড়ে পলাতক। ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম ... মরণ বলথে কিছু লাই হে কম্‌রেট। বাঁচাটো ল্যিয়ে যথো গোলমাল।" [৪২]

কালী ভাবে মাটি উপড়ে ফেললে সে কাকে দেখতে পাবে। এ কোন বসাই? সে কি দুলনার চেয়েও তরুণ, তার রিচুয়াল কি একটাই বাতাসের গলা মোচড়ানো। পঞ্চম মৃত্যুতে বসাইয়ের সঙ্গে অন্য লোক ছিল না পুলিশও ছিল না। তার মুদ্রাদোষটি কেউ শনাক্ত করেনি তবুও কালী

যেন কল্পনায় দেখতে পায় পঞ্চম বসাই অন্ধকারের গলা মুচড়ে পিষে দিয়েছিল— 'বাতাসকে মুচড়ে বাতাসকে অবয়ব দেবে একদিন, অন্ধকারে গলা মুচড়ে তাকে আগুন বানাবে।' কালীর দেখতে ইচ্ছে করে যে-রাতে পঞ্চম বসাইকে গোর দিয়ে ষষ্ঠ বসাই হয়ে চলে গেল সে কী রকম— 'খুব সুন্দর হোক সে, খুব তরুণ, খুব কালো রং, খুব সুন্দর'। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একলা কালী সাঁতরার যাত্রা বসাই-এর উদ্দেশ্যে, বসাই হয়ে যাওয়া বসাইয়ের উদ্দেশ্যে। কালী নিজের পথ খুঁজে পায়, চিনতে পারে তার গন্তব্যকে। আসলে বসাইরা মরে না, সময়ই এক একজন বসাই-এর জন্ম দেয়। আর তাকে শনাক্ত করতে পথের উদ্দেশ্যে গন্তব্যের সন্ধানে একজন কালী সাঁতরাকেও উপস্থিত করে সময়ই। তাই বসাই কোনও ব্যক্তি নয়, সমষ্টির প্রতীক। সমষ্টি থেকে সে হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তিত্ব, প্রতিবাদের একক কণ্ঠস্বর। রুহিতন কুরমি (মহাকালের রথের ঘোড়া) বসাই টুডু— দ্রৌপদী মেঝেন, দুলনা মাঝি, মুসাই, বেতুল : সকলেই এই প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। প্রান্তজনের অধিকার অর্জনের লড়াই শুরু করে ওরাই।

তথ্যসহায়কসূত্র

১. অমর ভট্টাচার্য, নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন, 'যে গল্পের শেষ নেই... নকশালবাড়ি আন্দোলনের ইতিহাস'; নয়াইস্তাহার।

২. সম্পাদনা অনিল আচার্য, 'সত্তর দশক', কৃষক আন্দোলন, পৃষ্ঠা—৭৯।

৩. প্রদীপ বসু, 'নকশালবাড়ির পূর্বক্ষণ কিছু পোস্ট মডার্ন ভাবনা', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা—১৭।

৪. আজকাল, ২৪.৫.৯২, পৃষ্ঠা—১০।

৫. আজিজুল হক, 'নকশালবাড়ি : তিরিশ বছর আগে এবং পরে' দে'জ, পৃষ্ঠা—২১।

৬. নকশালবাড়ির পূর্বক্ষণ, ঐ, পৃষ্ঠা—২৭।

৭. ঐ, পৃষ্ঠা—৩৯।

৮. 'নকশালবাড়ি : তিরিশ বছর আগে এবং পরে', ঐ, পৃষ্ঠা—২১।

৯. অমর ভট্টাচার্য, নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন, ঐ, পৃষ্ঠা—১৮।

১০. ঐ, পৃষ্ঠা—১৮-১৯।

১১. ঐ, পৃষ্ঠা—২১।

১২. আজিজুল হক, ঐ, পৃষ্ঠা—২২।

১৩. অমর ভট্টাচার্য, ঐ, পৃষ্ঠা—২৩।

১৪. 'সত্তর দশক', ঐ, পৃষ্ঠা—৩২।

১৫. মহাশ্বেতা দেবী, 'সত্তর দশক এবং তার পরে', অনুষ্টুপ, ঐ, পৃষ্ঠা—৪৩।

১৬. সমরেশ বসু, 'মহাকালের রথের ঘোড়া', আনন্দ পাবলিশার্স, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, জুন ২০১৩ (প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৭৭), ভূমিকা।

১৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, দে'জ, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৪, পঞ্চম সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, পৃষ্ঠা—২৭৮।

১৮. সুনীতিকুমার ঘোষ, নকশাল বাড়ি : একটি মূল্যায়ন, পিপলস্ বুক সোসাইটি, পৃষ্ঠা—৯।

১৯. অমর ভট্টাচার্য, নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন, 'যে গল্পের শেষ নেই... নকশালবাড়ি আন্দোলনের ইতিহাস'।

২০. মহাকালের রথের ঘোড়া, পৃষ্ঠা—১০।

২১. ঐ, পৃষ্ঠা—৩৩।

২২. ঐ, পৃষ্ঠা—৫৩।

২৩. ঐ, পৃষ্ঠা—৩০।

২৪. ঐ, পৃষ্ঠা—৫২-৫৩।

২৫. ঐ, পৃষ্ঠা—৮১।

২৬. ঐ, পৃষ্ঠা—৬১।

২৭. স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়, 'রূপকথার দেশে', এবং জলার্ক, চারু মজুমদার, সংখ্যা-১, সম্পাদনা স্বপন দাসাধিকারী, জানু-সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃষ্ঠা—২৫।

২৮. ঐ, তরাইয়ের চিঠি, চিঠি-১, চারু মজুমদার।

২৯. এবং জলার্ক, চারু মজুমদার, সংখ্যা-৩, অক্টোবর ২০১০, মার্চ-২০১১, পৃষ্ঠা—১২৯।

৩০. ঐ, পৃষ্ঠা—১০২-১০৩।

৩১. ঐ, পৃষ্ঠা—১০৩।

৩২. মহাশ্বেতা দেবী, অগ্নিগর্ভ, পৃষ্ঠা—১৫।

৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা—১৯।

৩৪. ঐ, পৃষ্ঠা—১৯।

৩৫. ঐ, পৃষ্ঠা—২১।

৩৬. ঐ, পৃষ্ঠা—২২-২৩।

৩৭. ঐ, পৃষ্ঠা—৩০।

৩৮. ঐ, পৃষ্ঠা—২৬।

৩৯. ঐ, পৃষ্ঠা—৪১।

৪০. ঐ, পৃষ্ঠা—৫২।

৪১. ঐ, পৃষ্ঠা—৯০।

৪২. ঐ, পৃষ্ঠা—৯৮-৯৯।